Adorn
BOOKS

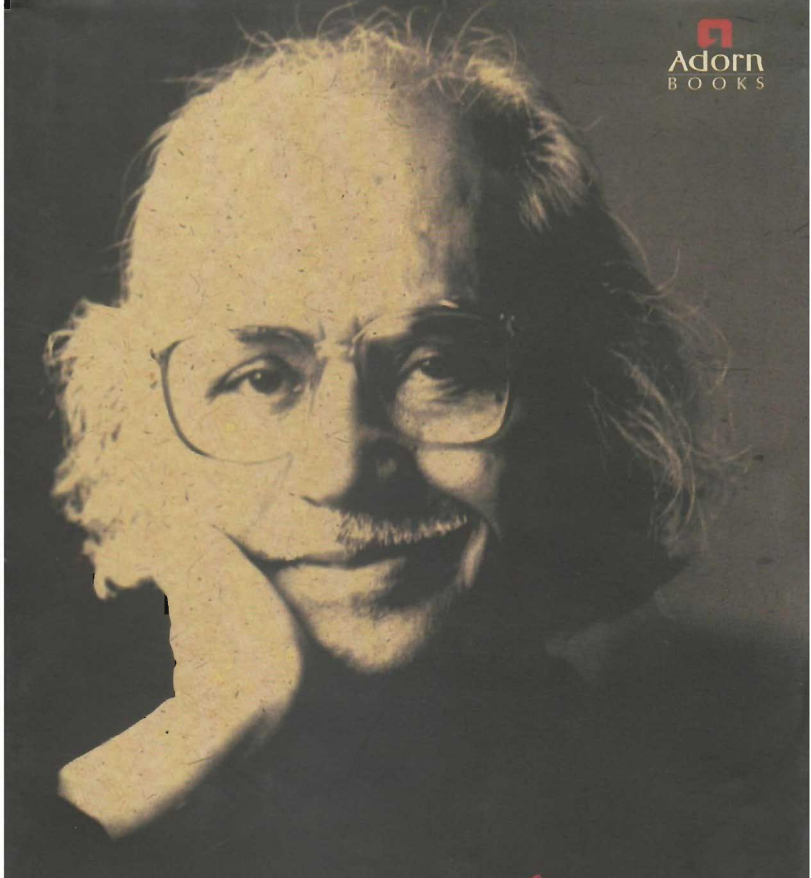

আমার ছোটবেলা

কবীর চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ দেশের যাঁরা গুণীজন ও খ্যাতিমান তাঁদের ছোটবেলাটা কেমন ছিল—এ কথা কার না জানতে ইচ্ছে করে! আর তিনি যদি হন সদ্যপ্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী তাহলে আগ্রহটা চেপে যাওয়া মুশকিল বৈকি। সদাহাস্যমুখর ও সর্বসাধারণের প্রিয় এই মানুষটির ছোটবেলা কেমন ছিল তা নিজেই তিনি একটুখানি মেলে ধরতে চেয়েছিলেন জীবনাবসানের অল্পকাল আগে। কেন যেন উৎসুক ছিলেন হারিয়ে যাওয়া শৈশবের দিনগুলোতে আবার অবগাহনে মেতে উঠতে। পাঠকের মনে হতে পারে কী-এক অদ্ভুত যোগ ছিল সাম্প্রতিক এই স্মৃতিচারণ ও সম্প্রতি তাঁর প্রয়াণের! *আমার ছোটবেলা* পড়তে পড়তে কবীর চৌধুরীর শৈশব-কৈশোরের অনেক জানা ও অজানা কথার সাথে পরিচিত হব, দেখব এক ছোট্ট কবীর চৌধুরীকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবীর চৌধুরী (১৯২৩-২০১২)। বরেণ্য সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। বাংলা ও ইংরেজিতে তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রচুর। সাহিত্যে ও শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ছোটবেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

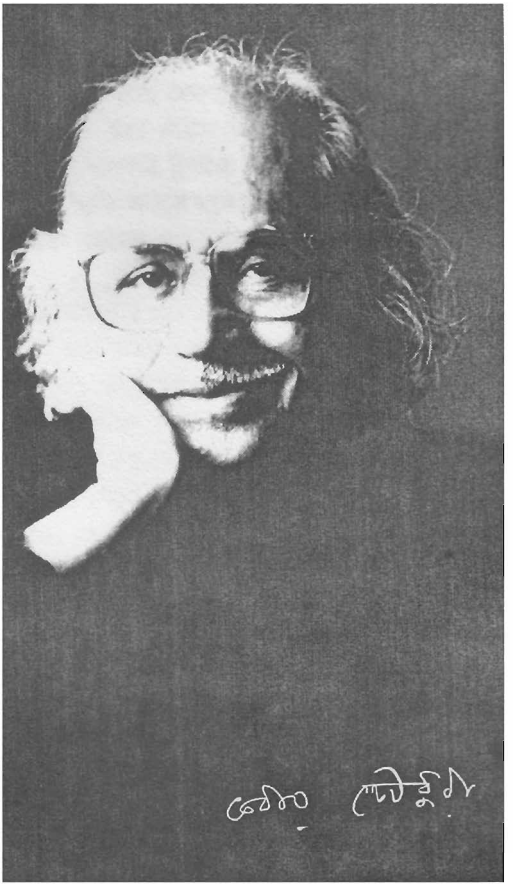

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ছোটবেলা

কবীর চৌধুরী

Adorn BOOKS

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪১৮

আমার ছোটবেলা ❖ কবীর চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ ❖ ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রকাশক ❖ সৈয়দ জাকির হোসাইন ❖ অ্যাডর্ন পাবলিকেশন

২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ।

ফ্যাক্স : ৯৩৬২৯৪৯ ফোন : ৯৩৪৭৫৭৭, ৮৩১৪৬২৯

চট্টগ্রাম অফিস : ৩৮ এন. এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ৪০০০। ফোন : ৬১৬০১০

মুদ্রণ ❖ প্যানটোন কালার পয়েন্ট এন্ড এক্সেসরিজ, ১১/৩ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

গ্রন্থস্বত্ব ❖ লেখক

প্রচ্ছদ ও বই নকশা ❖ সব্যসাচী হাজরা

মূল্য ❖ একশত ষাট টাকা মাত্র

Amar Chhotobela ❖ Kabir Chowdhury

[A memoirs on childhood]

Published in February 2012

Published by Syed Zakir Hussain ❖ Adorn Publication

22 Segun Bagicha, Dhaka 1000, Bangladesh.

Fax : 9362949 Tel : 9347577, 8314629

www.adornbd.com www.adornbooks.com e-mail : adorn@bol-online.com

Copyright : Author

Cover & Book design : Sabyasachi Hazra

Price : Tk. 160.00 US $ 10 UK £ 7

ISBN 978-984-20-0284-7

Ap-484-2012

All rights reserved. No Part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Adorn Publication.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গত

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। তিনি সম্প্রতি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর এই চলে যাওয়াতে দেশবাসীর সাথে আমরাও শোকাহত। আমরা তাঁকে যুগ যুগান্তর স্মরণ করতে চাই—তাঁর জীবনযাপন, চিন্তা ও কর্মের জন্য। তিনি মৃত্যুর বেশ কিছুদিন আগে অ্যাডর্নের অনুরোধে তাঁর ছেলেবেলা নিয়ে একটি ছোট পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে তুলে দেন। তাঁর মতোই আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছোটবেলার কথা নিয়ে রয়েছে অ্যাডর্নের এক সিরিজ পরিকল্পনা। পাঠকের সুবিধার জন্য তাঁর পাণ্ডুলিপিটি আলাদা আলাদা পর্বে ভাগ করে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। সিরিজের অন্য বইগুলো পাঠকের হাতে তুলে দিতে না পারলেও অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে তাঁর দেওয়া নামকরণে *আমার ছোটবেলা* বইটি তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১
স্মৃতি জাগানিয়া
১৩
মায়ের কাছে শোনা গল্প
১৭
গ্রামের নাম গোপাইরবাগ
২৫
ভুবনঘরের নানাবাড়ি
৩৩
বগুড়া থেকে পিরোজপুর
৪১
পিরোজপুরের মজার অভিজ্ঞতা
৪৯
শৌখিন বাবা ও তাঁর বন্ধুবান্ধব
৫৫
স্কুলজীবনের প্রিয় শিক্ষক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৯
কলেজিয়েট স্কুলে

৬৫
চার ফুট নয় ইঞ্চি টুর্নামেন্ট

৭১
নিউ থিয়েটার্সে ম্যাটিনি শো

৭৭
কলেজিয়েট স্কুলের সহপাঠীরা

৮৩
প্রিয় হিমাংশু

৮৯
সাইকেলে পূর্ববঙ্গ সফরের পরিকল্পনা

৯৩
নৌকা বাইচ ও জন্মাষ্টমীর উৎসব

৯৭
এন্ট্রান্স শেষে কলেজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

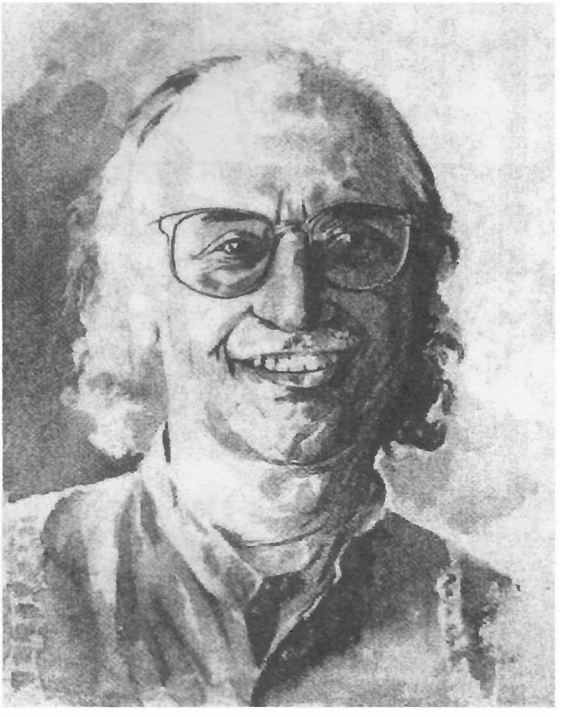

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতি জাগানিয়া

স্মৃতি সতত সুখের। স্মৃতি অনেক সময় প্রতারকও বটে। তবু স্মৃতি মানুষের এক চমৎকার সম্পদ। অবশ্য একটু বয়স না হলে এ সম্পদের যথার্থ মূল্যায়ন করা যায় না এবং বয়স যত বাড়তে থাকে, স্মৃতি যেন তত দূর অতীতের গর্ভে সরে যেতে থাকে। একটা সময় আমার মা মাঝে মাঝেই গতকালের কথা ভুলে যেতেন, কিন্তু সেই সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগের বহু ঘটনা তার স্মৃতিতে নির্ভুলভাবে থাকত। আমার শৈশবের স্মৃতি দু'টি জায়গাকে ঘিরে। তার একটি নোয়াখালীতে আমাদের গ্রাম, গ্রামের বাড়ি, যে বাড়ির আসল নাম মুন্সী বাড়ি, কিন্তু বাবা ওই এলাকায় প্রথম ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হবার পর গ্রামের মানুষ নিজেরাই ওই বাড়ির নতুন নামকরণ করে ডেপুটি বাড়ি। আমরা বড় হয়েও শুনেছি মামা ও খালুরা বাবাকে সম্বোধন করছেন 'ডেপুটি ভাই' বলে। কেমন যেন শোনাত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে খুব বেশি সংখ্যক বাঙালি মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ লাভ করেননি। কাজেই আজ ওই রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বোধন যতটা অবাক করা মনে হয় সেদিন ততটা ছিল না। আমার পিতৃপিতামহের দেশ নোয়াখালী হলেও আমার জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

আমার কোন্ বয়সের কথা আমার মনে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে? কত ছোটবেলার কথা মানুষের মনে থাকা সম্ভব? আমার জীবনের একেবারে খুব ছেলেবেলার কথা, যেসব কথা আমার নিজের মনে থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, যা শুধু মার মুখে শোনা, তা দিয়ে শুরু করা যাক।

আমার জন্ম ১৯২৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি। মা-বাবার আমি প্রথম সন্তান। বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরে। বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস-এ পরীক্ষা দিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। চাকরিসূত্রে সারা বঙ্গদেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে। কোথায় মেদিনীপুরের কাঁথি, ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকার মানিকগঞ্জ, মুর্শিদাবাদের লালবাগ, বাখরগঞ্জের পটুয়াখালী ও পিরোজপুর, উত্তরবঙ্গের বগুড়া, তারপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার পর পাবনা, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি নানা জায়গায় তাঁকে থাকতে হয়েছে, দু'বছর-আড়াই বছর তিন বছর করে।

আমার যখন জন্ম তখন তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কর্মরত। চাকরি জীবনের প্রথমদিকে, অবশ্য একেবারে শুরুর কাল নয়, কয়েক বছর চাকরি হয়েছে, বয়স তেত্রিশের মতো। মা ছিলেন বাবার চাইতে অনেক ছোট। আমার জন্মের সময় মায়ের বয়স মাত্র পনেরো কি ষোলো পেরিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের কাছে শোনা গল্প

মায়ের কাছে শোনা আমার খুব ছোটবেলার দু'একটি গল্প বলি। আমি নাকি বেশ বেশি বয়স অবধি মাতৃদুগ্ধ পান করি। কিছুতেই অভ্যাসটা ছাড়ানো যাচ্ছিল না। একদিন বাবা অনেক আদর করে আমার কাছ থেকে সম্মতি ও প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন যে কাল থেকে আমি আর বুকের দুধ খাব না। তারপর যথাসময়ে প্রচণ্ড ক্ষুধায় আমি খাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। গরুর দুধ দেয়া হলো বোতলে করে, মুখেই তুললাম না। কান্না, জেদ, অস্থিরতা। শেষে মা নিরুপায় হয়ে বুকের দুধ দিয়েই আমার ক্ষুধা মিটাতে এগিয়ে এলেন কিন্তু তাও আমি মুখে নেব না। জেদ আর কান্না সমানে চলল কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় নাকি কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ি। আর ঘুম থেকে ওঠার পর গরুর দুধ দিতেই নির্বিবাদে তা খেয়ে নিই। এরপর আর কোনোদিন আমি মাতৃদুগ্ধ পান করিনি। মা নাকি দু'একবার কৌতূহলী হয়ে পরখ করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি মুখ সরিয়ে নিয়েছিলাম। সেই নাকি আমার ভেতরকার জেদি চরিত্রের প্রথম প্রকাশ। এরই সূত্র ধরে মা আরেকটা গল্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেন , তখন আমার বয়স খুব সম্ভব সাড়ে তিন কি চার বছর। আমি মায়ের সঙ্গে কুমিল্লায় মামাবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। মেজ মামা শহরের নামকরা উকিল। খুব রাশ-ভারি, আবার খুব শৌখিনও। ছাত্রাবস্থায় গান গাইতেন, বাঁশি বাজাতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'—ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয় গান। এসব গল্প অবশ্য আমি বড় হওয়ার পর শুনেছি। মামার বাসায় ছিল সুন্দর গোলাপ বাগান। এক ছুটির দিনে মামা বারান্দায় বসে কি সব মামলার কাগজপত্র দেখছেন, আমার মা ওপাশে রান্নাঘরে তাঁর ভাবির সঙ্গে গল্প করছেন, আর আমি গুটি গুটি পায়ে বারান্দা থেকে নেমে বাগানের মধ্যে গিয়ে ফুল দেখে বেড়াচ্ছি। একটা ঝলেমলে প্রস্ফুটিত গোলাপের দিকে সবে হাত বাড়িয়েছি, এমন সময় হঠাৎ বারান্দা থেকে মামার অনুচ্চ কিন্তু গম্ভীর গলা ভেসে এল, 'উঁহু, হাত দেয় না।' আমি চমকে হাত সরিয়ে নিলাম; কিন্তু বাগান থেকে না উঠে এসে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর খুব ধীরে ধীরে আবার ফুলটির দিকে হাত বাড়াতেই আবারো মামার গলা, 'আঃ!' এবং এবার একটু জোরে। কখন দেখেন মামা? কিভাবে দেখেন? তাঁর কি তিনটে চোখ নাকি? নাকের ওপর চশমা এঁটে তো নিচু মুখে কাগজপত্রই দেখে যাচ্ছেন। বেশ কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর আমি আবার ওই একই গোলাপ ফুলটির দিকে হাত প্রসারিত করেছি, আর অমনি মামা দ্রুত পায়ে বারান্দা থেকে নেমে এসে 'কি হচ্ছে? বারণ করলাম না!' বলেই আমার হাতটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি তারস্বরে এমন চিৎকার করে উঠেছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে রান্নাঘর থেকে আমার মা মামি পড়ি কি মরি করে ছুটে এসেছিলেন, অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন আমার নানি। তারপর আমাকে কোলে নিয়ে আদর করে শান্ত করার কত চেষ্টা; কিন্তু আমার নাকি কাঁদতে কাঁদতে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সে কি দুঃখে, ক্ষোভে, রাগে, অপমানবোধে? মার ধারণা, আর কিছু নয়, জেদ।

আমার প্রায় এই বয়সেরই আরেকটা গল্প। দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়ার পর মা একটা পত্রিকা হাতে নিয়ে শুয়েছেন। আমি বাড়ির শান বাঁধানো উঠানে বসে খেলছি। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে। মা দু'বার ডেকে বলেছেন, আমি যেন রোদ্দুর থেকে বারান্দার ছায়াতে কিংবা ঘরের মধ্যে চলে আসি। আমি কান দিইনি। মা বিছানা থেকে উঠে হাত ধরে আমাকে বারান্দায় নিয়ে এসেছেন। খানিকক্ষণ পর আমি আবার বাইরে চলে গেছি। বাইরে খেলতে খেলতে আপন মনে একটা শব্দ করার পর মা টের পেলেন আমি কোথায়। হঠাৎ খুব রেগে যান তিনি। দ্রুত বাইরে এসে আমার গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা, এক্ষুনি ভেতরে যা।' আমি মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মায়ের রাগ আরো বেড়ে গেল। তিনি আমার দু'কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে থাক এই রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, কক্ষনো ভেতরে যাবে না।' এই কথা বলে তিনি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েন কিংবা ভুলেই যান আমার কথা। বেশ কিছুক্ষণ পর ফের বাইরে এসে আমাকে দেখে মায়ের চক্ষু স্থির। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, মা আমাকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝাঁকুনি দিয়ে যেখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক সেই জায়গায়। মুখ লাল, প্রায় অগ্নিবর্ণ, কপাল-গাল-চুল সব ঘামে ভিজে গেছে। পায়ের নিচে ফোস্কা পড়ে গেছে। মা আমার হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে যেতে চাইলে আমি বলেছিলাম, 'কেন? তুমিই তো বলেছিলে এখানে যেন দাঁড়িয়ে থাকি, কক্ষনো যেন ভেতরে না যাই।'

এসব ঘটনার কথা আমার কিছু মনে নেই।

আমার ছেলেবেলার টুকরো টুকরো, কিন্তু মোটামুটি স্পষ্ট, যেসব স্মৃতি আমার মনে আছে তা আমার সাত ও সাত-পরবর্তী বয়সের।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামের নাম গোপাইরবাগ

যেমন আমার মনে আছে, আমাদের বাল্য ও কৈশোরে বাবা আমাদের প্রতি বছর দিন পনেরোর জন্য দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। সেই সব দিনের স্মৃতি আজও আমার মনে আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে। আমাদের গ্রামের নাম গোপাইরবাগ। তখন ছিল রামগঞ্জ থানায়। এখন নতুন প্রশাসনিক বিন্যাসে এটা পড়েছে চাটখিলে। আমার মনে আছে, ১৯২০-এর দশকের শেষ ও ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে আমাদের গায়ের পাশ দিয়ে জেলা বোর্ডের রাস্তা চলে গিয়েছিল। কাঁচা কিন্তু বেশ ভাল রাস্তা। গরুর গাড়ি, পায়ে হাঁটা মানুষ ও সাইকেলই বেশির ভাগ সময় চলাচল করত। তবে শীতের মৌসুমে কালেভদ্রে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে দু'একটা মোটরগাড়িকেও আমরা চলাচল করতে দেখেছি। ওই রাস্তার পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল একটা খাল। সারা বছর পানি থাকত সেখানে। খালের ওপর ছিল একটা সরু বাঁশের সাঁকো। প্রথম দিকে ভয় করত, পরে তরতর করে সাঁকো পার হয়ে ওপারে চলে যেতাম। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রাম থেকে সব চাইতে কাছে যে রেল স্টেশন ছিল তার দূরত্ব প্রায় সাত-আট মাইল। সোনাইমুড়ি। কী চমৎকার নাম, তাই না? সোনালি রঙের মুড়ি? গুড় মাখালেই তো তাই হয়। ছেলেবেলায় আমরা দেশের বাড়ি গেছি দু'ভাবে। চাঁদপুর পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে বেশ বড় সুন্দর নৌকা বন্দোবস্ত করে একেবারে বাড়ির কাছে খালের পাড়ে গিয়ে থেমেছি। নদীর বুকে আমাদের সে কী ফুর্তি! বন্দরে-গঞ্জে নৌকা থামিয়ে বাজার করা হচ্ছে, চাল-ডাল, তরিতরকারি, নদীবক্ষে সরাসরি জেলে নৌকা থেকে কেনা হচ্ছে সদ্যধৃত মাছ, নৌকাতেই রাঁধাবাড়া হচ্ছে, খেতে বসে মনে হতো যেন অমৃত। নদী তীরে গ্রাম জীবনের কত ছবি। নৌকা যখন আমাদের গাঁয়ের দশ-পনেরো মাইলের মধ্যে এসে পৌঁছত তখনই কেমন করে যেন বাবা যে বার্ষিক ছুটি কাটাতে দেশে আসছেন সে খবর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত। মাঝে মাঝেই খালের পাড়ে লোকজন এসে দাঁড়াতেন, বাবা মাঝিদের নৌকা থামাতে বলতেন, তাঁদের সঙ্গে প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় এবং বাক্যালাপ করতেন। কিন্তু এর চাইতেও অন্য এক স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বলতর হয়ে জেগে আছে। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগের সেই ছবি যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। খালের পাড়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে এসে জড়ো হয়েছে। নৌকার ছইয়ের নিচ থেকে বের হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি, আমার ছোট ভাই মুনীর, আর বাবা। গাঁয়ের সাধারণ মানুষের জীবনে সেদিনও প্রাচুর্য বা সচ্ছলতা ছিল না। কিন্তু সে জীবন কিছুতেই আজকের মতো এতটা হতশ্রী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরানন্দ ও দারিদ্র্যলাঞ্ছিত ছিল না। খালের পাড়ে যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে জড়ো হতো তাদের বেশির ভাগের মুখেই থাকত ঝলমলে হাসি, চোখে ঔৎসুক্য ও কৌতুকের ছটা, কণ্ঠে আনন্দিত কলকাকলি। বাবা নৌকা থামাতে বলতেন, ভেতর থেকে একটা বড় টিন নিয়ে আসতেন। সেই টিনে থাকত সেকালের বিখ্যাত সুস্বাদু জনপ্রিয় চ্যাপ্টা গোল বিস্কুট। বেলা বিস্কুট। বাবা ছেলেমেয়েদের হাতে বিস্কুট তুলে দিতেন। কেউ কেউ লাজুক মুখে, হৈ চৈ করতে করতে, তাঁর হাত থেকে বিস্কুট গ্রহণ করত। তুলনাহীন আঞ্চলিক ভাষায় বাবার সঙ্গে কথা বলত, তিনিও সে ভাষাতেই তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন। তারপর আমাদের নৌকা আবার এগিয়ে যেত আমাদের বাড়ির দিকে। গ্রামে পৌঁছে খালের পাড়ে নৌকা থেকে নেমে বাড়ি অবধি যাবার জন্যে আমাদের অল্প একটু পথ হেঁটে যেতে হতো। বাড়ির সীমানায় এসে প্রথমেই চোখে পড়ত পারিবারিক গোরস্তান। গাছগাছালিতে ঢাকা, পুকুরের এক পাড়ের পাশে, লম্বা টানা আকারের। নিতান্ত অনাড়ম্বর ঘরোয়া গোরস্তান, মার্বেল বাঁধাই নেই, মার্বেল ফলক নেই। অধিকাংশ কবরই সবুজ ঘাস আর মাটি দিয়ে ঘেরা, কারো কারো কবরের চারপাশে দু'একটি পাতাবাহার ও ফুলের গাছ। এইখানেই শুয়ে আছেন আমাদের কয়েক পূর্বপুরুষ। বাবা বাড়িতে ঢোকার আগে এখানে দাঁড়িয়ে কবর জেয়ারত করতেন, দোয়াদরূদ পড়তেন, হাত তুলে প্রার্থনা করতেন। আমরাও তার সঙ্গী হতাম। এত বছর কেটে গেছে, এক দশকে এক দিনও এসব কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে পড়ে কিনা সন্দেহ, কিন্তু আজ লিখতে বসে স্মৃতির গভীর থেকে তুলে আনতে গিয়ে দেখি যে তা অক্ষয় ও অমলিন হয়ে টিকে আছে। নদীপথে নৌযান ছাড়াও আমরা কখনো কখনো দেশে গেছি সোনাইমুড়ি পর্যন্ত ট্রেনে, তারপর ধূলিধূসরিত জেলা বোর্ডের সড়ক ধরে গরুর গাড়িতে। সে আরেক অভিজ্ঞতা। একবার কুয়াশাঘেরা শীতের সকালে মাথায় চাদর জড়িয়ে ওই দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছিলাম সেকথা স্পষ্ট মনে আছে। রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার চাদর, গলার মাফলার, গায়ের সোয়েটার সব একে একে খুলে ফেলে হাতে নিতে হয়েছিল। কত বয়স তখন আমার? বারো-তেরোর বেশি নয়। খুবই কষ্ট হয়েছিল বলে তো মনে পড়ছে না। পথে পথে থেমেছি, গৃহস্থ বাড়ির উঠানে বসে বিশ্রাম করেছি, গাছ থেকে সদ্য পেড়ে আনা ডাবের পানি ও তার ভেতরকার সর খেয়েছি। সেবার বাবা সঙ্গে ছিলেন না। সহযাত্রী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনরত আমার এক চাচাতো ভাই। নোয়াখালীর স্মৃতি মানেই আমার কাছে মূলত দেশের বাড়ির স্মৃতি, যৌথ পারিবারিক জীবনের স্মৃতি। দশ-বারো বছরের বালক আমি, নিজেকে মনে করতাম রীতিমতো বড়। অথচ চাচী-জেঠি-ফুফুরা জোর করে কোলে বসাবেন, হাত দিয়ে চিবুক তুলে ধরে গালে চুমু খাবেন, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করবেন। দারুণ অস্বস্তি বোধ করতাম, কিন্তু মধ্যে যে কী গভীর স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা ছড়িয়ে থাকত তা সেই অপরিণত বয়সেও বুঝতে ভুল হতো না। আমার মেজ জেঠিমা ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসন্তান। লম্বা-চওড়া, কালো রঙ, দেখতে তেমন ভাল নন, কিন্তু অসম্ভব ভাল মানুষ ও অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। আমি রাতে তাঁর ঘরে তাঁর বিছানাতেই ঘুমাতাম। কত গল্প করতেন, পুঁথির কাহিনী—ইমাম হানিফা, বিবি সোনাভান, কারবালার গল্প। ভারি সুন্দর দেখতে আমার এক তরুণী চাচাতো বোন ছিলেন, ফাতিমাবু'। ফর্শা রঙ, ঢলঢলে মুখ, ঠোঁটের কোনায় সব সময় একটা মিষ্টি হাসি। আর আমার আরেক চাচাতো বোন ছিলেন, বিবাহিতা তিনিও খুব সুন্দর ছিলেন দেখতে। মাহমুদাবু'। সংসারকর্মে অত্যন্ত নিপুণ, খুব গোছালো আর পরিশ্রমী। আমি আর মুনীর একবার মাইল তিনেক হেঁটে তাঁর ওখানে বেড়াতে যাই। আমাদের পেয়ে তার খুশি আর ধরে না। তখনই তাঁর ধীর স্থির স্বামীকে ডাকাডাকি করে অস্থির করে তুলেছিলেন। গাছ থেকে ডাব পাড়াতে হবে, ঝাঁকি জাল ফেলে পুকুর থেকে মাছ ধরাতে হবে, মুরগি জবাই করতে হবে, এখুনি ছুটে গিয়ে বাজার থেকে এটা ওটা কিনে আনতে হবে। বুবু নিজে যেন তখন দশভুজা। নারকেল কুড়িয়ে বাটিতে করে চিড়া আর গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছেন। তরতর করে কাঠবিড়ালীর মতো মই বেয়ে উপরে উঠে ঘরের মাচা থেকে শুকনো তালশাঁস পেড়ে এনে বঁটি দিয়ে দুভাগ করে খেতে দিচ্ছেন। এক ফাঁকে উনুনের সামনে বসে রান্না শুরু করে দিয়েছেন, আর আমাদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন, শহরের নানা খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করছেন। আমার ওই বোন অনেক দিন আগে মারা গেছেন। তাঁর কথা প্রায়ই মনে পড়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও খুব বেশি তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ আমার হয়নি। শৈশবের নোয়াখালীর স্মৃতিতে মনের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে পুকুর ঘাট, নারকেল-সুপারির বাগান, বাঁশবন, টানা জাল দিয়ে মাছ ধরা, ছিপ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা, দিনের মধ্যে দশবার ডাব খাওয়া, সকালে খেঁজুরের রস, মাঝে মাঝেই হরেক রকম পিঠা, রাত্রিবেলায় কুপির ম্লান আলোয় পুঁথি পড়া, পুকুরের অপর পাড়ে মসজিদে মিলাদ-মাহফিল। সন্ধা রাত্রেই সব কিছু নিঝুম হয়ে যেত। ঝিঁঝিঁর একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে রাত্রের পাখির ডাক ও পাখা ঝাপটানি, এমনকি শিয়ালের হুক্কা হুয়া ধ্বনিও যেন আজও কানে বাজে। আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল বারুইদের পাড়া। সেখানে তাদের ঠাণ্ডা ছায়াছায়া পানের বরজের ভেতর দিয়ে হাঁটতে যে কী ভালোই লাগত। কয়েক বছর আগে যখন গ্রামে গিয়েছিলাম তখন তাদের খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম যে ওরা বহু দিন আগেই দেশ ছেড়ে চলে গেছে।

আমাদের ছেলেবেলায় জেলাটির নাম ত্রিপুরা-ই ছিল। ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকরা বলত *টিপারা*। ওই রকম অনেক কাণ্ডই তারা করেছে। কলকাতা হয়েছে *ক্যালকাটা*, বর্ধমান *বার্ডওয়ান*, ময়মনসিংহ *মাইমেনসিঙ্গ*, চট্টগ্রাম চিটাগঙ্গ। টিপারা নামকরণের ক্ষেত্রে, কে জানে হয়ত *ইট ইজ এ লঙ্গ ওয়ে টু টিগারারি* গানের অনুরণন তাদের মনে একটা দোলা জাগিয়েছিল। পরে জেলার নাম আর ত্রিপুরা থাকেনি, কুমিল্লা হয়ে গিয়েছিল। আমার ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ত্রিপুরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথা কুমিল্লা জেলায় আমার নানাবাড়ি আর মামাবাড়িকে ঘিরে। নানাবাড়ি হলো ত্রিপুরা জেলার মুরাদনগর থানার ভুবনঘর গ্রামে। গ্রামের নামটি কী সুন্দর। স্কুলে পড়ার সময়ই বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালী* পড়া হয়ে যায়। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের নাম মনে গেঁথে আছে। ভুবনঘর নামটি তার চাইতে কম আকর্ষণীয় নয়। মা আমাদের নিয়ে প্রায় নিয়মিতভাবে, বছরের একবার না হলেও এক বছর অন্তর অন্তর, ভুবনঘরে যেতেন, দু'তিন সপ্তাহের জন্য। দাদাবাড়ির তুলনায় আমাদের নানাবাড়ি ছিল অনেক বেশি জমকালো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুবনঘরের নানাবাড়ি

আমরা যখন নানাকে দেখি তখন তার অনেক বয়স হয়ে গেছে। তখন আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন ঐ ব্যবসায়। অনেক জমিজামা করা ছাড়াও তিনি ভুবনঘরের মতো অজপাড়াগায়ে নিজেদের থাকার জন্য চকমিলানো বিশাল এক অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। নানার কথা আমার খুব বেশি মনে নেই। ফরসা টকটকে রঙ ছিল তার। খুবই শান্ত প্রকৃতির, কোমল স্বভাবের, দয়ালু। খুব কম কথা বলতেন। সে তুলনায় নানী ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী, আলাপচারিতায় নিপুণ, স্নেহময়ী, প্রয়োজনে কঠোর শাসক। ভুবনঘরের নানাবাড়িতে অনেক আনন্দময় দিন কেটেছে আমাদের। বিশাল দোতলা বাড়ি, সে আমলের কথা অনুযায়ী বড় বড় উঁচু ছাদওয়ালা ঘর, চওড়া বারান্দা। দোতলার ঘরগুলোর সামনের দিকে বেশ খানিকটা ছাদহীন খোলা জায়গা, গোলাকার ভারী কলাম। দোতলায় উঠবার জন্য একটি সিঁড়ি বাইরের দিকে, এক পাশে, সে সিঁড়িটা একটু সরু। সেটা দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোতলার বাইরের দিকের প্রথম ঘরটিতে উঠতে পারা যায়। আরেকটা সিঁড়ি অন্দরমহলের দিকে, অন্য পাশে চৌকি পাতা, ছোটদের খাবার ব্যবস্থা ওখানেই হতো। প্রায় ছ'ফুট উঁচু একটা মিটসেফ ছিল, তিন পাশে কাঠ, সামনে জাল, তারের। সকালে নাস্তা হতো এক থালা ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত, তার ওপর মামী কিংবা খালা কিংবা পরিবেশনকারী বুয়া ঢেলে দিতেন সোনালি রঙের টলটলে এক চামচ বিশুদ্ধ গাওয়া ঘি। সঙ্গে পেতাম ডিম ভাজা, কখনো আলু ভাজি। রান্নাঘর সংলগ্ন চৌবাচ্চাটি ব্যবহৃত হতো মাছ জিইয়ে রাখার জন্য। তার মধ্যে মাছ ছাড়া বা রান্না করার জন্য তার মধ্য থেকে মাছ তুলবার দৃশ্য আমরা ছোটরা দেখতাম পরম কৌতূহলের সঙ্গে, নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে। রান্নাঘরের উল্টো দিকে, আঙ্গিনার অন্য প্রান্তে, একটা টিনের চাল দেয়া লম্বা ঘর ছিল। তার সামনে ছিল টানা বারান্দা। এখনো মনে আছে বারান্দায় একটা পাল্কী পড়ে থাকতে। বেশ ভালো অবস্থায়। নিশ্চয়ই কিছু দিন আগেও ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু আমরা কাউকে চড়তে দেখিনি। অন্দরমহলে বাড়ির চারপাশে কত গাছপালা। একটি বাতাবি লেবুর গাছ, এখনো যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। রান্না ঘরের উল্টো দিকে আঙ্গিনার এক প্রান্তে যে টানা ঘরটির কথা বললাম সেখানে বিশালাকার ডোল, মটকা ও অন্যান্য আধারে, মাটির ও বেতের, সঞ্চিত থাকত নানা প্রকার শস্য, প্রধানত ধান ও চাউল। বছরের খোরাকি। এক একটা ডোল এত বড় ছিল যে, তার মধ্য থেকে শস্য তোলার জন্য একটি ছোট ছেলেকে ঝুড়ি হাতে নিচে নামিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়া হতো। তার হাত থেকে বাইরে দাঁড়ানো একজন ঝুড়ি তুলে নিত। উঠোন পেরিয়ে একটুখানি ছায়া ঘেরা জায়গা ছাড়িয়ে ছোট্ট বাঁক নিতেই পুকুরঘাট। ঘাটের প্রবেশ পথে ছোট একটা দরজা। ঘাট ডান দিকে রেখে আরেকটু এগিয়ে গেলে বাড়ির পেছনের দিকের প্রবেশ পথ। এটা ছিল মূল ভবন থেকে অনেকটা দূরে। এর দরজা সাধারণত তালাবদ্ধ থাকত। আর সমস্ত বাড়ি ঘিরে ছিল উঁচু ইটের পাঁচিল। পুকুরটি ছিল বিশাল এবং গভীর। স্বচ্ছ টলটলে পানি, বাঁধানো ঘাট, চওড়া, পানির নিচে অনেক দূর পর্যন্ত সিঁড়ি নেমে গেছে। পুকুরের একটা ব্যবস্থা দেখে বেশ মজা পেতাম আমরা ছোটরা। ঘাটের এক পাশ দিয়ে মস্ত বড় একটা পাকা দেয়াল, উঁচু থেকে অনেক দূর পর্যন্ত, পানির ভেতর নেমে গেছে ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে। উদ্দেশ্য পর্দার কাজ করা। পুকুরের বাঁ পাড় ও এই ঘাটের উল্টো দিকে ছিল গাছপালা, তার ওপাশেও বোধ হয় একটা প্রাচীর ছিল, ঠিক মনে পড়ছে না। তবে ডান পাড়ে ছিল পুরুষদের তথা বার বাড়ির ঘাট। ওই ঘাট থেকে ভেতর বাড়ির ঘাটকে আড়াল করে রাখার জন্যই ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে যাওয়া দেয়ালটি নির্মিত হয়। দেয়ালে শ্যাওলা পড়ে পড়ে একটা কোমল সুন্দর সবুজের প্রলেপ পড়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে নিচের দিকে। আমরা অনেক সময় ওই দেয়ালের উপরে চড়ে বসে ওপাশে পুরুষদের ঘাটে তাদের স্নান ও সাঁতার কাটার দৃশ্য দেখতাম। অলিখিত আইন মেনে তারা কেউ একটা বিশেষ সীমানার বাইরে সাঁতার কেটে এগিয়ে আসতেন না, যার ফলে স্নানরত মেয়েরা সর্বদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকত। আমরা আট-দশ বছরের কয়েকটি ছেলেমেয়ে, মামাতো-খালাতো ভাইবোনেরা, বেশির ভাগ সময় অন্দরমহলের এই ঘাটে প্রচণ্ড হৈ-হুল্লোড় করে স্নান করতাম। আমাদের মধ্যে দু'একজন ছিল আরো কম বয়েসের। ছোটরা যেন কখনো একা ঘাটে না আসে তা সুনিশ্চিত করার জন্য বাড়ির একজন বয়স্কা কাজের মহিলা আমাদের একটা সাংঘাতিক কাহিনী শুনিয়েছিলেন। কণ্ঠস্বর উঠিয়ে নামিয়ে, চোখ ছোট-বড় করে, কখনো দ্রুত লয়ে, কখনো দীর্ঘ বিরতি দিয়ে খুব নাটকীয়ভাবে তিনি কাহিনীটা বলেছিলেন। এই পুকুরে নাকি একটা অস্বাভিক জীব বাস করে। সিন্দুকের মতো দেখতে, উপরের দিকে একটা ডালা জাতীয় জিনিস আছে, যেন অতিকায় কাছিমের খোলস; মোটা শিকলের মতো হাত-পা, সাধারণত পুকুরের গভীর তলায় দিকে থাকে। তবে মাঝে মাঝে ভুস করে মাঝ পুকুরে ভেসে ওঠে, তখন উপরের ডালাটা একটু খুলে যায়। পানির জীব হলেও তার হয়ত কখনো-সখনো খাওয়ার দরকার হয়। অনেক দিন আগে ওই সিন্দুক প্রাণীটি একটি বছর ছয়েকের বাচ্চা ছেলেকে ডালা ফাঁক করে তার শিকল হাত দিয়ে নিজের ভেতরে টেনে নিয়েছিল। ছেলেটি অভিভাবকদের চোখে ধুলো দিয়ে এক নির্জন অপরাহ্নে একা একা পুকুরের পানিতে নেমে দুষ্টুমি করছিল। ঘাটের সিঁড়িতে শুধু একটা শার্ট পাওয়া যায়, এছাড়া তার আর নাম-নিশানা কিচ্ছু কোথাও পাওয়া যায়নি। লোকজন নামিয়ে সারা পুকুর তোলপাড় করা হয়, কয়েকবার জাল টানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, খোঁজ পাওয়া গেল না—সিন্দুক প্রাণীটিরও না। একটু বড় হয়ে অবশ্য বুঝতে পারি যে ওই সিন্দুক প্রাণীর বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তা ছিল নেহাৎই আজগুবি কল্পনার ফসল, ছোটরা যেন একা একা পুকুরে না আসে তা সুনিশ্চিত করার জন্য একটা বাজে কৌশল। কিন্তু তখন, ওই ছেলেবেলায়, সে কাহিনী শুনে আমাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল, হাত-পা যেন সেঁধিয়ে গিয়েছিল পেটের ভেতর, নড়তে পারতাম না একটুও। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে, সাধারণত গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটিতেই আমরা ভুবনঘর যেতাম, ওই পুকুরের গাছগাছালির ছায়া ফেলা শীতল জলের হাতছানি মনে যত আলোড়নই তুলতো না কেন, একা একা আমরা কেউ তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতাম না।

সেই সময় আমরা কত অসম্ভব কাহিনীই না শুনেছি, বেশির ভাগই বয়স্কা কাজের মহিলাদের কাছ থেকে। এর একটি কাহিনী আমার নানীকে নিয়ে। কিন্তু কাহিনীটা বলার আগে নানী সম্পর্কে দু'একটা কথা বলেই নিই। তখন নানীর বয়স ষাটের মতো। সামান্য বেশিও হতে পারে। দেহের বাঁধুনি শক্ত, গায়ের রঙ শ্যামলা, লম্বা নন, মুখশ্রীর বিবেচনাতেও সুন্দরী বলা যাবে না। কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা, অসামান্য সাধারণ জ্ঞান, বিদ্যানুরাগ, যুক্তিবাদী মন এবং গরিব অসহায় মানুষের প্রতি গভীর মমতার জন্য তিনি ছোট-বড়, আত্মীয়-অনাত্মীয়, কাছের ও দূরের অজস্র মানুষের পরম শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। বাংলা, আরবি ও উর্দু খুব ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতেন। ফারসিও কিছু কিছু। আমার মা-খালারা তাঁর কাছেই পড়াশোনা করেছেন নিজেদের ছোটবেলায়। সেই আধা-সামন্ত যুগের মানুষ হয়েও নানী কখনো কাউকে বিত্ত বা পেশা বংশমর্যাদার ভিত্তিতে উঁচু-নিচু জ্ঞান করতেন না। তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিল বিদ্বান ব্যক্তি। আমরা যখন নানীকে দেখি, যে সময়ের কথা আমার মনে আছে, তখন তিনি হজ্ব করে এসেছেন। ওই গণ্ডগ্রামে বসেও তখন তিনি কাজকর্ম ও হাঁটাচলার সুবিধার জন্য ষাটোর্ধ্ব বয়সে শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার কামিজ ওড়না পরতে শুরু করেছিলেন। এর ফলে কারো ভ্রূ উত্তোলিত হলো কিনা সেটা তাঁর জন্য কোনো বিবেচনা বিষয়ই ছিল না। তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধির অধিকারী, নারী শিক্ষার জন্য নিবেদিতপ্রাণ, অত্যন্ত ধার্মিক কিন্তু সম্পূর্ণ গোঁড়ামিহীন ও অসাম্প্রদায়িক। রোজ সকালে নামাজ পড়ার পর তিনি অনেকক্ষণ ধরে কোরআন শরীফ পড়তেন। ভারি সুরেলা কণ্ঠ ছিল তাঁর।

ভুবনঘরে আমাদের নানাবাড়ির ছাদটা ছিল একটা ছোটখাটো ফুটবল মাঠের মতো। দোতলা থেকে ছাদে ওঠার সিঁড়িটা ছিল ভেতর বাড়ির দিক দিয়ে। ছাদের চারপাশের দেয়াল ছিল বেশ উঁচু। ছাদের কোনায় ছিল একটা মাঝারি আকারের চিলেকোঠা। সেখানেও ঢুকতে হতো দু'তিনটা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে, একটু উপরে উঠে। চিলেকোঠাটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। ঘরের এক পাশে তাকের ওপর নানীর আরবি-ফারসি কেতাব ইত্যাদি, আত্মসমাহিত হয়ে আরাধনা করার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুনির্দিষ্ট স্থানে একটা জায়নামাজ পাতা, দু'চারটা মখমলের ঢাকনা দেয়া বালিশ। সব মিলে আমাদের ছোটদের কাছে মনে হতো এক রহস্যময় অপার্থিব পরিমণ্ডল। বিশেষ বিশেষ তারিখে নানী তাঁর ওই চিলেকোঠায় একা কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। তখন আমাদর ছাদে যাওয়ার বারণ থাকত।

আমার ছোটমামা, নানা-নানীর কনিষ্ঠতম, সন্তান, কী সুন্দর ছিলেন দেখতে। কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় মাত্র বিশ বছর বয়সে হঠাৎ রোগে পড়ে মারা যান। তাঁর বৃদ্ধ মা বাবার মনে সেই শোক যে কতখানি কঠিন আঘাত হেনেছিল তা সহজেই কল্পনা করা যায়। নানী ওই দুঃসময়ে মনের গভীর থেকে প্রচণ্ড অধ্যাত্মশক্তি তুলে এনে আশ্চর্যভাবে আত্মসংবরণ করেছিলন। তবু মাঝে মাঝে নির্জনে অবাধ্য অশ্রু তাঁর নিয়ন্ত্রণ মানত না। ওই রকম এক মুহূর্তে নানা নাকি নানীকে লক্ষ করে বলেছিলেন, এটা আমার মায়ের কাছে শোনা, নানা বলেছিলেন—আচ্ছা, আপনি কাঁদেন কেন, বিশ বছর তো ছেলেকে দেখেছেন। কত মা বাবা যে এই ভাগ্যটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়। নানা-নানী পরস্পরকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। বিয়ের প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু নানীকে নিয়ে যে বিচিত্র কাহিনীটি শুনেছিলাম এবার তার কথা বলা যাক। বাড়ির এক পুরানো বৃদ্ধা পরিচারিকা আমাদের বলেছিলেন যে নানীর অনেক অলৌকিক ক্ষমতা আছে। ফিসফিস করে আমার কানের কাছে মুখ এনে তিনি বলেছিলেন, নানীর দুটি অনুগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বিন আছে। নানী যখন চিলেকোঠায় বসে এবাদত-বন্দেগী করেন তখন মাঝে মাঝে ওরা তাঁর কাছে আসে।

আমরা প্রায়ই দুটি বিরাট আকারের দাঁড়-কাককে নানীর চিলেকোঠার ছাদের ওপর বসে থাকতে দেখতাম। ওই কাক দুটিই নাকি জ্বিন। কাকের রূপ ধরে আসে। কত সহজে কত কথাই যে তখন বিশ্বাস করতাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বগুড়া থেকে পিরোজপুর

১৯৩০ সালের কথা। বাবা তখন বগুড়ায় মহকুমা হাকিম। আমি পড়ালেখা করতে শুরু করেছি, কিন্তু তখন পর্যন্ত স্কুলে ভর্তি হইনি। বাড়িতেই পড়ি। বাবা বিকেলে অফিস থেকে ফিরেই পড়া নেন, হাতের লেখার উন্নতি হচ্ছে কিনা দেখেন। হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য তিনি একটা চমৎকার কাঠের ফ্রেমে অ আ ক খ সুন্দর হস্তাক্ষরে খোদাই করে দিয়েছিলেন, তার ওপর পেনসিল বুলিয়ে অভ্যাস করতাম আমি। খুব জোর দেয়া হতো শুদ্ধভাবে চেঁচিয়ে পড়ার ওপর, যতি এবং ঝোঁক এমনভাবে দিতে হবে যেন অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বানান যেন ভুল না হয়, আর হাতের লেখা শুধু যেন পরিচ্ছন্নই হয় না, রীতিমতো আকর্ষণীয় হয়। জোর দেয়া হতো কবিতা মুখস্থ করার ওপরও। *ছোট পাখি ছোট পাখি কোথা যাও নাচি নাচি* কিংবা সকালে *উঠিয়া মনে মনে বলি*-র মতো কবিতা প্রায়ই আবৃত্তি করে শোনাতে হতো বয়স্ক অতিথি অভ্যাগতদের। অনেক সময় খুব খারাপ লাগত। এখন সচেতনভাবে নাতি-নাতনিদের এরকম পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে না দিতে চেষ্টা করি আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বগুড়ায় আমার সাত-আট বছর বয়সের জীবনের কিছু কৌতূহলোদ্দীপক স্মৃতি আছে। এক বানরওয়ালা আসত, ডুগডুগি বাজিয়ে সে তার বানরের খেলা দেখাতো। বানরের পরনে থাকত লাল জামা, মাথায় ছোট একটা টুপি। প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী বানরটি ঘুরে ঘুরে নাচতো, হাততালি দিত, ডিগবাজি খেত, সালাম করত এবং শেষে হাত পেতে পয়সা চাইত।

আমাদের বাড়ির সামনে একটা মাঠ ছিল। মাঠের একধারে একটা ঘরে কিছু তরুণ একটা ক্লাব করেছিল। কলেজের ছেলেরা। এক পাশে কাঠের আলমারিতে গল্পের বই, টেবিলের ওপর কয়েকটা পত্রপত্রিকা, আর ঘরের অন্য এক পাশে ব্যায়ামের কিছু সরঞ্জাম। আমার মনে আছে আমার বয়সী চার-পাঁচটি ছেলেমেয়েসহ আমি ওই ক্লাবে যেতাম। ঘরের বাইরে মাঠে একটি তরুণ অধিনায়কের নির্দেশে পায়ের তাল মিলিয়ে মার্চ করতাম কিছুক্ষণ, তারপর ঘরের ভেতরে কাঠের ছোরা দিয়ে চলত ছোরা খেলার অনুশীলন।

AMARBOI.COM

বাবা কোনোদিন এ কাজে বাধা দেননি। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ রাজের প্রভুভক্ত আমলা। ওই ক্লাবের পেছনে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে যাদের যোগ ছিল তারা যে কংগ্রেসের বামঘেঁষা ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী গোষ্ঠী, এ তথ্য নিশ্চয়ই তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন যে সাত-আট বছরের একটি বালককে এসব সম্পর্কে সচেতন করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। সত্য বলতে কি ওই ক্লাবের রাজনৈতিক মাত্রিকতা সম্পর্কে সে সময় আমার কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে কিছু না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝেও, ওই বাল্যকালেই মনের অবচেতনায় একটা প্রতিবাদী সত্তার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল কিনা কে জানে। বগুড়ার ওই ক্লাবের সান্নিধ্য আমি অবশ্য খুব বেশি দিন পাইনি।

১৯৩২-এ বাবা বদলি হয়ে গেলেন পিরোজপুরে। সেখানেই আমি প্রথমবারের মতো স্কুলে ভর্তি হই। ১৯৩৩ সালের কথা প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ বাড়িতে শেষ করে স্কুলে এলাম একবারে পঞ্চম শ্রেণীতে।

এতদিন নিজের পোশাকি নাম ব্যবহার হতো না, এবার স্কুলের খাতায় সেই নাম উঠে এল। আমার নামকরণ হয়ে যায় আমার জন্মের বহু আগে, বস্তুতপক্ষে আমার মায়ের জন্মের অল্পকালের মধ্যেই। আকিকার সময় আমার মায়ের নাম রাখা হয় উম্মে কবীর আফিয়া বেগম। অর্থাৎ কবীরের মাতা আফিয়া বেগম। যথাসময়ে তাঁর পুত্রসন্তান হওয়ার পর আমার নাম হলো কবীর। তখনকার দিনের প্রথা অনুযায়ী পুরো নামটি বেশ বড় রাখা হলো আবুল কালাম মোহাম্মদ কবীর। ইংরেজিতে সংক্ষেপ করে আমি লিখতাম এ. কে. এম. কবীর। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি চাকরির সময় সব নথিপত্রে ওই নামই বহাল আছে। পঞ্চাশের দশকে যখন লেখালেখি শুরু করি তখন থেকে আমি বাবার পদবি নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করে কবীর চৌধুরী লিখতে শুরু করি। মুনীর অবশ্য গোড়া থেকেই নিজের নাম মুনীর চৌধুরী লিখতো, যদিও তার সম্পূর্ণ নামটিও ছিল বেশ বড়: আবু নঈম মোহাম্মদ মুনীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কবীর বলে আমাকে প্রায় কেউ-ই ডাকত না। আমার ডাকনাম মানিক। জন্মাবার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে থাকার সময়ই ভালো নাম রাখা হয়ে যায়; কিন্তু তখন অবধি ডাকনাম কিছুই পাকাপাকিভাবে ঠিক হয়নি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে বাবা বদলি হয়ে আসেন মানিকগঞ্জে। এবার ডাকনাম ঠিক হয়ে গেল মানিক। বাবা আমাকে বুকে নিয়ে গান গাইতেন, আয়রে চাঁদের কণা, আয়রে আয় আমার সাত রাজার ধন মানিক। খুব সম্ভব দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের কলির সঙ্গে নিজের কিছু কথা মিলিয়ে নিয়েছিলেন।

বলছিলাম পিরোজপুর স্কুলের কথা। স্কুলে একেবারে নতুন পরিবেশ, রুটিন বাঁধা পড়াশোনা, বাড়ির কাজ, পরীক্ষা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, খাপ খাইয়ে নিতে কিচ্ছু অসুবিধা হলো না। বাড়িতে যতদূর পড়েছিলাম তার মান ক্লাস ফাইভের চাইতে বেশি বই কম ছিল না। ইংরেজিতে খুব ভালো ছিলাম। বাংলা, ইতিহাস, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতিতেও খারাপ ছিলাম না। শুধু অংকতেই একটু দুর্বলতা ছিল। আসলে ওই বিষয়টির প্রতি কোনো উৎসাহই বোধ করতাম না। এখনো করি না। অথচ বুদ্ধি দিয়ে বুঝি যে অংক একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ডিসিপ্লিন এবং ঠিকভাবে পরিবেশন করতে পারলে খুব আকর্ষণীয়ও।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর খেলাধুলার প্রতি আকর্ষণ ভীষণ বেড়ে গেল। এর আগে মার্বেল খেলেছি, গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্ধা খেলেছি, ডাংগুটি খেলেছি। এবার নেশার মতো পেয়ে বসলো ফুটবল খেলা। মার্বেল যে সম্পূর্ণ বাদ গেল তাও নয়। বিশেষ করে দুপুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিফিনের বিরতির সময় মার্বেল খেলা নিয়ে মেতে উঠতাম। যেদিন অন্যকে হারিয়ে প্রতিপক্ষের মার্বেল জিতে নিতাম সেদিন খুশির অন্ত থাকত না। উল্টোটা ঘটলে বেজায় মন খারাপ হয়ে যেত।

এসব খেলা ছাড়াও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য বেশ সময় নিয়ে অনুশীলন করতাম। প্রাথমিক ও চূড়ান্ত বাছাইয়ে আমি একশো গজ দৌড়, লং জাম্প ও হাই জাম্পে টিকে যেতাম; কিন্তু প্রতিযোগিতার সময় প্রথম বা দ্বিতীয় হতাম শুধু একশো গজ দৌড়ে।

স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দের ব্যাপার। আবৃত্তিতে অংশ নিতাম, ইংরেজি ও বাংলা দু'টোতেই। ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তিন শ্রেণীতেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি, কিছুতেই প্রথম হতে পারিনি। একই সহপাঠী আগাগোড়া প্রথম হয়েছে। তার সঙ্গে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল আমার কিন্তু একটুও অসদ্ভাব ছিল না বরং বন্ধুত্বই ছিল। আমরা দু'জনেই ছিলাম ছোটখাটো দেখতে, রোগা, ধর্মের দিক থেকে আলাদা, আমি মুসলমান আর ও হিন্দু। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে আমার অবস্থান ঈষৎ ওপরে; কিন্তু তবু একটা সহজ অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল আমাদের দু'জনের মধ্যে। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময়ই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। আজ তার নামটাও মনে পড়ছে না।

পিরোজপুরে যে ছেলেটির সঙ্গে আমার সবচাইতে বেশি ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে সে আমারই ক্লাসের আরেক সহপাঠী। লেখাপড়ায় ছিল মাঝারি কিন্তু খুব চটপটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর খেলাধুলায় পারদর্শী। আমার চাইতে লম্বা, শক্ত-সমর্থও। তার সঙ্গেও ১৯৩৫ সালের পর আর দেখা হয়নি কিন্তু ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত পত্রের মাধ্যমে আমাদের যোগাযোগ ছিল। নাম অরুণেশ লাহিড়ী। ১৯৪১-এ বি.এ পাস করার আগেই অরুণেশ ভাইসরয়'স কমিশন নিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। ষাটের দশকে যখন ওর চিঠি পাই তখন সে ভারতের মধ্যপ্রদেশে ক্যাপ্টেন পদে একটি রেজিমেন্টে রয়েছে।

আমার পিরোজপুর স্কুলের সহপাঠীদের আর কারো সঙ্গে পরবর্তী সময়ে দেখা না হলেও ওপরের ক্লাসে পড়তেন এমন তিনজনের সঙ্গে পরে মোটামুটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছে। এরা তিনজনই জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। একজনের নাম আবদুল করিম। খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে তিনি তখন খুব সম্ভব নবম শ্রেণীতে। পরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হয়ে পুলিশ সুপিরিয়র সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি যখন একটি জেলা শহরে এস.পি. হিসেবে কর্মরত তখন তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। আমারও তখন কর্মজীবন চলছে। অনেক দিন তাঁর কোনো খবর জানি না। আরেকজন ছিলেন আহসান হাবীব। তিনি আজ বেঁচে নেই; কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই আমাদের কবিতার ভুবনে তাঁর অবদান ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলা একাডেমী পুরস্কার, আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, একুশে পদকসহ নানা সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। তাঁর *রাত্রিশেষ, ছায়া হরিণ, সারা দুপুর, আশায় বসতি, মেঘ বলে চৈত্রে যাবো, দুই*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে দুই আদিম পাথর প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তিনি যে সৃষ্টিসম্ভার রেখে গেছেন তা তাঁকে বাংলা কবিতা, যা আমি পড়েছিলাম অনেক দিন আগে, আমার স্মৃতিতে আজও অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'কোনো এক বাদশাজাদীর প্রতি' আর 'রেডরোডে রাত্রিশেষে'। শেষের কবিতাটি পরেও পড়েছি, কিন্তু প্রথম কবিতাটি নয়। আর তৃতীয় ব্যক্তি হলেন আমাদের চিত্রকলা জগতের প্রথমদিকের প্রথম সারির একজন মানুষ। জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দিন আহমদ, আনওয়ারুল হক, কামরুল হাসান প্রমুখের সঙ্গে বাংলাদেশের চিত্রকলার ভিত গড়ে তোলার কাজে রত ছিলেন। তাঁর নাম শফিকুল আমীন। পিরোজপুর স্কুলে তিনি যখন ক্লাস নাইন কিংবা টেনে পড়েন তখন তাঁর আঁকা একটা ছবি দেখেছিলাম। একটি গাছের ডালে দুটি পাখি বসে আছে। ছবিটিতে উজ্জ্বল রঙের কাজ কী ভালো যে লেগেছিল বলতে পারব না। ওঁর সঙ্গে পরে একাধিকবার দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে। বাংলাদেশের বহু টেলিভিশন দর্শক তাঁকে অন্য একটি ভূমিকায়ও জানে। শরীর কিভাবে ভালো রাখতে হয় সে সম্পর্কে তিনি বেশ কিছুদিন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন, চমৎকারভাবে মৌল বিষয়গুলো দর্শক-শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। সত্তর বেশ আগে পেছনে ফেলে এসেও তার নিজের স্বাস্থ্য তখনও ঈর্ষণীয়। চিত্রকলা ও শরীরচর্চার মতো দুটি বিষয়কে একই সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে তিনি মিলিয়েছেন নিজের জীবনে। পরিণত বয়সেও। এ প্রসঙ্গে কামরুল ভাইয়ের কথা মনে পড়ে আমার। কৈশোর ও যৌবনে কামরুল হাসান শরীরচর্চায় বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসাহী ছিলেন, মেতে উঠেছিলেন গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলন নিয়ে। তাঁর ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটার সঙ্গে দেশপ্রেম, মাটি ও ঐতিহ্য ইত্যাদিরও একটা সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী সময়ে কামরুল ভাই প্রত্যক্ষভাবে শরীরচর্চা আন্দোলনের সঙ্গে আর যুক্ত থাকেননি; কিন্তু সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব তিনি সর্বদা উপলব্ধি করতেন এবং তরুণদের মধ্যে এ বিষয়ে ঔদাসীন্য তাঁকে ব্যথা দিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিরোজপুরের মজার অভিজ্ঞতা

তিরিশের দশকের প্রথমার্ধে পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময়কার কিছু কিছু স্মৃতি আজও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। অমিয় বলে একটি ছেলে ছিল। গৌরবর্ণ, একহারা চেহারা। চমৎকার কাবাডি খেলত। বাইরে থেকে তাকে দেখে মনে হতো না যে তার গায়ে খুব জোর আছে, কিন্তু বেশ শক্তিশালী ছিল সে। তার চাইতেও বড় কথা, অমিয় ছিল খুব ক্ষিপ্রগতি ও কুশলী। চোখের পলকে প্রতিপক্ষের অঙ্গনে গিয়ে একজনকে ছুঁয়ে দিয়ে তড়িৎ গতিতে এঁকেবেঁকে পিছলে নিজের এলাকায় ফিরে আসত। আর একটি ছেলে ছিল, নাম হীরালাল। দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হতো। দেহের তুলনায় মাথাটা ছিল মস্ত বড়ো। পড়ালেখায় ভালো ছিল না। তাকে আমরা ডাকতাম মোটামাথা বলে। দুই অর্থে। সাধারণত রাগ করত না, তবে মাঝে মাঝে খুব ক্ষেপে যেত।

পিরোজপুরের স্কুলজীবনের একটা মজার অভিজ্ঞতার কথা আমি কখনো ভুলব না। তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনেই স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান হবে, পরীক্ষায় যারা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হয়েছে তারা পুরস্কার পাবে, ছেলেরা আবৃত্তি করবে, দু'একজন গান গাইবে। আমি আবৃত্তিতে অংশ নেয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছি। যে ছেলেটি স্কুলের পরীক্ষায় আমার ক্লাসে প্রথম হতো সে, আর আমি, আমরা দু'জনে গলা মিলিয়ে এক সঙ্গে দ্বৈত আবৃত্তি করব। একটা ইংরেজি কবিতা। প্রার্থনা জাতীয়, ধর্মীয় অনুভূতিপূর্ণ। খুব সম্ভব প্রথম চরণটি ছিল : *এ্যাবাইড বাই মি, লর্ড*। জোর মহড়া চলছে। এই উপলক্ষে বরিশাল থেকে প্রধান অতিথি হয়ে আসবেন বাখরগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, একজন বাঙালি হিন্দু আই.সি.এস. অফিসার।

আমাদের ক্লাসের ইংরেজির শিক্ষক আমার সঙ্গী আর আমাকে খুব যত্নের সঙ্গে তালিম দিয়েছেন। কিভাবে দাঁড়াতে হবে, কোথায় একটু থামতে হবে, আবৃত্তির সময় কোথায় একটু ঝোঁক পড়বে, সব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা মঞ্চে উঠে শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে মুখ করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুক্তকর বুকের কাছে ঠেকিয়ে নম্র উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করব। খুব ভালো করে শিখলাম আমরা। আমাদের আবৃত্তি যে ভালো হবে স্যার সে বিষয়ে নিশ্চিত হলেন।

কিন্তু অনুষ্ঠানের মাত্র দু'দিন আগে হঠাৎ ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। তার জন্য আমি, আমার সহপাঠী ও সহআবৃত্তিকার, আমাদের স্যার, কেউ-ই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার বাবা মহকুমা হাকিম হিসেবে পদাধিকারবলে ছিলেন স্কুলের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট। মঞ্চে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসকের পাশেই বসবেন তিনি। তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধহয় মনে হলো, আমি তাঁর পুত্র, আমি কেমন আবৃত্তি করব সেটা তাঁর একটু পরীক্ষা করে দেখা উচিত। তিনি আমাকে ডেকে জানতে চাইলেন কেমন তৈরি হয়েছি আমি। যেন আমি সত্যি অনুষ্ঠানে সবার সামনে পরিবেশন করছি এমনভাবে আমাকে গোটা কবিতাটি আবৃত্তি করতে বললেন তিনি। আমি সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভভাবে দাঁড়িয়ে বুকের কাছে দুটি হাত জড়ো করে কোথাও একটু হোঁচট না খেয়ে সুন্দরভাবে টানা আবৃত্তি করে গেলাম। একেবারে গোড়াতেই আধেক আঁখির কোণ দিয়ে আমি চকিতে একবার লক্ষ করেছিলাম যে বাবার ভ্রূ দুটি কুঁচকে গেছে কিন্তু তারপর আর সেদিকে নজর দিইনি, তিনিও কোনোরকম বাধা দেননি। কিন্তু আবৃত্তি শেষ হওয়ার পর যা ঘটলো তা চমকপ্রদ।

বাবা আবৃত্তি শেষ হলে আমাকে জিগ্যেস করলেন আমি কবিতাটির অর্থ বুঝেছি কিনা এবং বুঝে থাকলে তা ব্যাখ্যা করে তাঁকে বলতে বললেন। আমি বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে বললাম যে কবিতাটিতে আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে আবেদন জানাচ্ছি তিনি যেন সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকেন, আমাদের শুভ ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করেন, সবসময় যেন আমাদের দিকে তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আমি যে কবিতাটি ঠিকমতো বুঝেছি, ভালভাবে ব্যাখ্যা করেছি সে সম্পর্কে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না; কিন্তু তবু বাবার মুখ গম্ভীর কেন? খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম আমি।

বাবার পরের প্রশ্ন : এটা কি রকম কবিতা? আমি উত্তর দিলাম, প্রার্থনাজাতীয় কবিতা। ধর্মীয় কবিতা।

আমাদের পরবর্তী সংলাপ এই রকম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা : তোমার ধর্ম কী? তুমি কোন্ ধর্মাবলম্বী?

আমি : বারে, আমার ধর্ম তো ইসলাম। আমি মুসলমান।

বাবা : তবে? কোনো মুসলমান ওইভাবে প্রার্থনা করে? বুকের কাছে হাত জড়ো করে, পাতায় পাতায় হাত মিলিয়ে, আঙুলগুলো একটার ওপর আরেকটা চেপে ধরে? নামাজের পর একজন মুসলমান যখন আল্লাহর কাছে কিছু চায় তখন সে কিভাবে মোনাজাত করে, কিভাবে হাত রাখে, তুমি তা জান না?

আমি সরু গলায় মিনমিন করে জবাব দিয়েছিলাম যে মহড়ার সময় আমাদের শিক্ষক এইভাবেই শিখিয়েছেন। বাবা গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিলেন যে একজন মুসলমান যেভাবে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে আমিও ঠিক সেইভাবে হাত রাখব, এতে যেন কোনো ভুল না হয়। তারপর তিনি যা বললেন, তার হাস্যকর দিকটি কিন্তু ওই অল্প বয়সেও আমাকে চমৎকৃত করেছিল। তিনি কঠোর মুখ করে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললেন, 'আরে, বোকা, তুই তো সৃষ্টিকর্তার কাছে কিছু চাইছিস, তাই না? তা হাত দুটি যদি ওইভাবে জুড়ে রাখিস তাহলে সৃষ্টিকর্তা যদি তোকে কিছু দেনও তুই তো তা হাতে নিতে পারবি না। কিছু হাত পেতে নিতে চাইলে হাত মেলে ধরতে হবে না? যেমন আমরা নামাজ-শেষে মোনাজাত করার সময় করি। ঠিক?'

আমি ওই সময় বাবাকে কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারিনি যে আমরা অনেকেই সাধারণত যেভাবে মোনাজাত করি তাতেও দু'হাতের মাঝে যে ফাঁক থাকে তা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার দেয়া দ্রব্যসামগ্রীর প্রায় সবটুকুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলে পড়ে যাবে। কিন্তু বাবার নির্দেশ অমান্য করার কথা আমরা ভাইবোনেরা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারতাম না।

এবার ওই আবৃত্তি অনুষ্ঠানের অবস্থা শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল সে কথা বলি। অনুষ্ঠানের আগের দিন চূড়ান্ত মহড়া হচ্ছে। স্যার আমাকে এতদিন ধরে শেখানো ভঙ্গি বাদ দিয়ে হঠাৎ মোনাজাতের মতো দু'হাত তুলে আবৃত্তি করতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আমি যখন কারণটা বললাম তখন তিনি চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখে বোধহয় একটা দৃশ্য ভেসে উঠেছিল। দুটি ছেলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একটা ইংরেজি কবিতার দ্বৈত আবৃত্তি পরিবেশন করছে। একটি ছেলের হাত বন্দনার মতো বুকের কাছে একত্রে জড়ো করা, আরেকটি ছেলের হাত সামনে মোনাজাতের ভঙ্গিতে প্রসারিত। কী রকম দেখাবে দৃশ্যটা? শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন যে কাউকেই হাত তুলতে হবে না। দু'জন আবৃত্তিকারই দু'পাশে দু'হাত লম্বা করে ঝুলিয়ে দিয়ে গলা মিলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যথোপযুক্ত আবেগের সঙ্গে আবৃত্তি করবে। তাই করেছিলাম আমরা। খুব ভালো হয়েছিল আবৃত্তি। প্রধান অতিথি প্রশংসা করেছিলেন আমাদের উচ্চারণের ও সার্বিক পরিবেশন ভঙ্গির। আজ মনে হচ্ছে বাবা যদি মহকুমা হাকিম না হতেন তাহলে হিন্দু-মুসলমানের কোনো কোনো আচরণ বিধিতে যে বহিরঙ্গের ভিন্নতা, যা প্রকৃত বিচারে তুচ্ছ—তাকে কেন্দ্র করেই হয়তো একটা জট পেকে উঠতো এবং ব্যাপারটার এত সহজ নিষ্পত্তি হতো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সময়টার কথা বলছি সেটা ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর সময়। পেছনে পড়ে থাকা মুসলমান সমাজ তখন তাদের প্রতি নানাক্ষেত্রে অবিচার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তার স্বাতন্ত্র্যবোধ উদ্দীপ্ত হচ্ছে, নিজের অধিকার অর্জনের জন্য তার মধ্যে একটা সংগ্রামী অনুভূতিও জেগে উঠেছে। কেউ কেউ এটাকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার দিকে নিয়ে যেতে চাইছেন, আবার কেউ কেউ এর মধ্যে যে আত্মমর্যাদাবোধের স্ফুরণ এবং অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিবাচক বোধগম্য ছিল না; কিন্তু পরে বড় হয়ে তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

আমার বাবার মধ্যে আমি কখনো সাম্প্রদায়িকতা দেখিনি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। ঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, প্রতিদিন ভোরে কিছুক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করতেন, সারাজীবন আচকান-পাজামা পরেছেন, মাথায় দিতেন লাল তুর্কি ফেজ, যাকে আমরা রুমী টুপি বলতাম, কেন তা আজও জানি না। দপ্তরে, সায়েব-সুবোদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সভা-সমিতিতে, কলকাতায় লাটভবনে সরকারি সম্মেলনে, সর্বত্রই তাঁর ছিল ওই এক পোশাক। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার পরও। আবার অন্যদিকে বেদ *গীতা উপনিষদ* ও *রামায়ণ মহাভারত* সম্পর্ক তিনি ভালোরকম অবহিত ছিলেন। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের অনেক মানবতাবাদী চমৎকার বক্তব্য তাঁর মুখস্থ ছিল। শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় তিনি তা উচ্চারণ করতে পারতেন। *বাইবেল*ও তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়া ছিল ভালো করে। সংস্কৃত ভাষায় বাবার উচ্চারিত কিছু কিছু প্রবাদবাক্য আজও আমার কানে বাজে। 'পুঁটিমাছের মতো ফরফর করা', 'শতবার ধুলেও কয়লার ময়লা মুছে না যাওয়া', 'পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতাই পরম তপস্যার বস্তু', 'মা আর মাতৃভূমি স্বর্গের চাইতেও বড়'—এসব তিনি ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার সময় এমন যুতসইভাবে প্রয়োগ করতেন যে তা মনের মধ্যে গভীরভাবে গেঁথে যেত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৌখিন বাবা ও তাঁর বন্ধুবান্ধব

বাবা খুব শৌখিন ছিলেন। পোশাক-আশাক সবসময়ই থাকত ধোপদুরস্ত, পাট ভাঙ্গা। বিশেষ শখ ছিল পাদুকার ব্যাপারে। মায়ের কাছে শুনেছি যে প্রথমদিকে বিশ জোড়া জুতা ছিল। আমরাও বারো তেরো জোড়া দেখেছি। দপ্তর থেকে বাড়িতে ফিরে নাশতা খেয়েই অফিসার্স ক্লাবে ছুটতেন টেনিস খেলার জন্য। তখন পরনে থাকত পাজামা আর সাদা শার্ট, পায়ে কেডস জুতা। ক্লাবে যেতেন সাইকেলে চড়ে। সাইকেলে উঠতেন পেছন দিক থেকে। পেছনের চাকার পাশ দিয়ে বের করা একটু অংশে পা রেখে খানিকটা ঠেলে নিয়ে গিয়ে লাফ দিয়ে আসনে বসতেন। তারপর প্যাডেলে পা রেখে চালিয়ে যেতেন। আজকাল কেউ ওভাবে সাইকেলে ওঠে না। সন্ধ্যার একটু আগে বাসায় ফিরে নামাজ পড়েই আবার ক্লাবে যেতেন ঘন্টাখানেকের জন্য। এবার তাস খেলতে। তখন পরনে নতুন পাজামা-শার্ট আর পায়ে পাম্পসু। বাবা প্রায়ই বলতেন যে আমরা অনেকে পোশাকের দিকে মনোযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলেও প্রায়ই পদযুগলের প্রতি অবহেলা দেখাই। এটা ঠিক নয়।

পিরোজপুরে বাবার দু'জন বন্ধুর কথা আমার বেশ মনে আছে। তার একটা কারণ এই যে তাঁদের সঙ্গে পরবর্তী জীবনে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল। দু'জনই আজ প্রয়াত। একজন ছিলেন বাবারই সার্ভিসের লোক। পিরোজপুর মহকুমার দ্বিতীয় অফিসার ছিলেন তখন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং সরকারের সচিব পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বাবার চাইতে বয়সে একটু ছোট, অত্যন্ত হাসিখুশি, প্রাণ-ঐশ্বর্যে ভরপুর, সবসময়ই প্রয়োজনের চাইতে উঁচু গলায় কথা বলতেন। ভালো টেনিস খেলতেন। ছেলের মতো স্নেহ করতেন আমাকে। আমি খালু ডাকতাম। তিনি ছিলেন মাহতাব উদ্দীন সরকার। উত্তরবঙ্গের লোক। কথা বলার সময় আঞ্চলিক টান লুকোবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করতেন না। প্রচুর পান খেতেন তিনি। আমি যখন চল্লিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগে চাকরি করি তখন তিনি ছিলেন আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তা। আমি টাঙ্গাইলে মহকুমা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন-শেষে পদোন্নতি লাভ করে কুমিল্লায় যোগ দিই জেলা কন্ট্রোলাররূপে। আমার আজও মনে আছে বছর দুয়েক সেখানে কাজ করার পর একবার ঢাকায় এসে খালুর বাসায় যখন দেখা করতে যাই তখন খালাম্মা আমার সামনেই তাঁকে লক্ষ করে বলেছিলেন, হ্যাঁগো, ছেলেটাকে আর কতদিন মফস্বলে ফেলে রাখবে? ওকে ঢাকায় বদলি করে আনা যায় না? খালু স্ত্রীর কথার উত্তরে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি তখন। কিন্তু এর মাস ছয়েকের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই আমি ঢাকায় বদলির হুকুম পাই। একই সঙ্গে আরো কয়েকজন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বদলির আদেশ পান। আমার চাকরির বার্ষিক রিপোর্টগুলো প্রথম থেকেই ছিল খুব ভালো। ফরিদপুর, রাজবাড়ী, টাঙ্গাইল এবং সর্বশেষ কুমিল্লা। সর্বত্রই আমি দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পাল করেছি, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছি সাহস ও তৎপরতার সঙ্গে। তাই আমাকে পূর্ববঙ্গের রাজধানী শহর ঢাকায় বদলি করার ব্যাপারে খালুকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। তিনি আজ বেঁচে নেই কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের মাধ্যমে ওই পরিবারের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র আজও অটুট আছে। বাংলাদেশের স্বৈরাচারী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকায় ফসিহউদ্দিন মাহতাব এবং আমার অবস্থান বেশ কাছাকাছি। তাঁর স্ত্রী ডাক্তার হাজেরা মাহতাব দীর্ঘদিন ধরে আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে আন্তরিকভাবে নির্দেশ পরামর্শ ব্যবস্থাপত্র দিয়ে আসছেন। ফসিহউদ্দিনের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী নাজমুন্নেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী। বিগত কয়েক বছর ধরে আমি লোকপ্রশাসন বিভাগের একটি পত্রের সঙ্গে বিভাগের বাইরের পেপারসেটার ও একজামিনার হিসেবে অধ্যাপিকা নাজমুন্নেসা মাহতাবের সঙ্গে কাজ করে আসছি।

বাবার আরেকজন বন্ধুর কথা উল্লেখ করেছিলাম। তিনি ছিলেন মহকুমা মেডিক্যাল অফিসার। ভারি সুদর্শন ছিলেন। সুন্দর স্বাস্থ্য। চমৎকার একজোড়া সযত্নলালিত পুরু গোঁফ তাঁর চেহারায় বিশেষ ব্যক্তিত্বের ছাপ এনে দিয়েছিল। সূক্ষ্ম রসজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকেও আমি খালু বলতাম, তাঁর স্ত্রীকে খালাম্মা। আমাদের এই তিন পরিবারের মধ্যে একটা ভারি সুন্দর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক দেখে এসেছি আমি, আমার সেই ছোটবেলা থেকে বড় হওয়ার পর অবধি। তিন স্ত্রীর মধ্যে যেমন তিন স্বামীর মধ্যেও তেমনি। বাবার এই তৃতীয় বন্ধু ছিলেন ডক্টর আমীন। আমি যখন ১৯৪৭ সালে টাঙ্গাইলে মহকুমা কন্ট্রোলার তিনি তখন ময়মনসিংহের সিভিল সার্জন। ময়মনসিংহে আমি যখন সরকারি কাজে গেছি, মাঝে মাঝে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে, তখন একাধিকবার তাঁর বাসায় উঠেছি। খালু ও খালাম্মার কাছ থেকে সেসব সময় যে যত্ন ও স্নেহ আদর পেয়েছি তার কথা আমাদের চিরকাল মনে থাকবে। এই খালুও আজ বেঁচে নেই। পরবর্তী সময়ে ঢাকায় তাঁর বড় ছেলে ব্যাংকার রুহুল আমীনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। আমার চাইতে বয়সে ছোট ছিল। সেও কয়েক বছর গুলশানে এক অবিশ্বাস্য মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল সেই রাতে।

পিরোজপুরে উচ্চতর সরকারি মহলে বাবা, মাহতাব সরকার ও ডক্টর আমীনের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল সর্বজনবিদিত। তিনজন কিন্তু বাইরের দিক দিয়ে ছিলেন ভিন্নরকম দেখতে। আলাপচারিতার ভঙ্গির দিক থেকেও তিনজন ছিলেন তিন রকম আঙ্গিকের অনুসারী। পিরোজপুর অফিসার্স ক্লাবে একবার নাট্যাভিনয় হয়। তাঁকে সকাল-সন্ধ্যায় কয়েকদিন ধরে দেখলাম নিজের বাড়ির টানা বারান্দায় পায়চারি করতে করতে নাটকের সংলাপ মুখস্থ করছেন। তিনি অভিনয় করেছিলেন আলমগীর চরিত্রে। ডাক্তার খালুও অভিনয়ে অংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছিলেন। খুব সম্ভব তিনি হয়েছিলেন সাজাহান। মাহতাব খালু অভিনয়ের আগের দিন বাবার কাছ থেকে তাঁর একট ভারী নীলচে সবুজ রঙের ড্রেসিংগাউন ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন, মঞ্চে একটা দৃশ্যে তিনি সেটা পরবেন। ওই ড্রেসিংগাউনে কোমরবন্ধটা ছিল অনেকটা মোটা পাকানো জাহাজের দড়ির মতো। কোনো কোনো স্মৃতি অকারণে মনের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে থাকে তার রহস্য বোঝা দায়। সেই ড্রেসিংগাউনটা যেন আমি আজও চোখের সামনে দেখতে পাই।

পিরোজপুর স্কুলে যে আড়াই বছর পড়েছিলাম সেটাই আমার বাড়ির বাইরে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা। তার আগে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলের পাঠক্রম অনুসরণ করে বাড়িতেই পড়াশোনা করেছি। তবে শুধু স্কুলের পাঠ্যসূচী নয়, তার বাইরেও অনেক কিছু পড়তে হয়েছে, শিখতে হয়েছে, বিদ্যাশিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী আমার পিতৃদেবের কাছ থেকে। তাঁর সাহায্যে ও নিপুণ নির্দেশে। অনেক সময়ই তিনি শেখাতেন একেবারে হাতে-কলমে এবং আজ যাকে আমরাও অডিও ভিস্যুয়াল বলি সেই প্রক্রিয়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুলজীবনের প্রিয় শিক্ষক

আমার প্রথম স্কুলজীবনের শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র দু'জনের কথা ভালোভাবে মনে আছে। তাঁদের দু'জনের মধ্যে পরেও দেখা হয়েছে। খুবই স্নেহ করতেন আমাকে। তখন কত বয়স আমার? দশ-এগারো মাত্র। স্বভাবের দিক থেকে লাজুক ছিলাম; কিন্তু একবার পরিবেশটা সহজ হয়ে উঠলে কথাবার্তা ও আচার-আচরণে বুদ্ধিদীপ্ত সপ্রতিভতা ফুটে উঠতে দেরি হতো না। ওই দু'জন শিক্ষক সেই সহজ পরিবেশটা সৃষ্টি করতে পারতেন। একজন অসচেতনভাবে, নিজের সস্নেহ ব্যবহার ও কোমল স্বভাবের গুণে। তিনি ছিলেন ফজলুল করিম স্যার। মৃদুভাষী, শান্ত, ধীরস্থির। একবার তাঁর দীর্ঘস্থায়ী কঠিন অসুখ হয়। তাঁর বাড়িতে সেবা-শুশ্রূষা করার ব্যাপারে কিছু পারিবারিক অসুবিধা ছিল। সেজন্য আমরা স্কুল থেকে একটা ব্রিগেডমতো গঠন করি। আমাদের ক্লাস থেকে আমরা দু'জনের এক একটা টিম তৈরি করে পালাক্রমে তাঁর দেখাশোনা ও সেবা করেছি সেই সময়। স্যারের জন্য তো মায়া ছিলই, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই বয়সে একটা কাজের মতো কাজ করছি তার জন্য এক ধরনের গর্ব ও আত্মতৃপ্তির ভাবও ছিল মনের মধ্যে। করিম স্যারের সঙ্গে পরেও দেখা হয়েছে। তিনি তখন বৃদ্ধ, চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন, আর আমি যুবক, নিজের চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিভা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখার কাজে অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিয়োজিত। তখনও স্যারের কাছ থেকে যে স্নেহ-শুভেচ্ছা পেয়েছি তা কখনো ভোলবার নয়। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে পরোক্ষ যোগাযোগটা অন্যদিক থেকে সম্প্রসারিত হয়েছে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইতিহাসে পিএইচ.ডি. ডিগ্রিপ্রাপ্ত ড. করিম আমার সহকর্মী হন ষাটের দশকের শেষদিকে। আমি যখন ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ তখন তিনি সেখানে ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। বাবার মতোই ধীরস্থির, শান্ত স্বভাবের, কিন্তু দৃঢ়চেতা, আদর্শনিষ্ঠ ও নীতিবান।

আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল আর যে দ্বিতীয় শিক্ষকের কথা উল্লেখ করছি তিনি হলেন শাহাবুদ্দীন স্যার। তিনি ছিলেন করিম স্যারের বিপরীত প্রকৃতির মানুষ। চটপটে, বুদ্ধিদীপ্ত, কথাবার্তায় প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল, একটু ছটফটে। দ্রুত কথা বলতেন কিন্তু অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে পারতেন অসম্ভব স্বচ্ছ ও আকর্ষণীয় করে। স্যারের সঙ্গে পরেও দেখা হয়েছে। দক্ষ ও প্রতিভাবান শিক্ষক হিসেবে ব্যাপক স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছেন তিনি।

আমার স্কুলজীবনের শিক্ষকদের মধ্যে বাংলার সুকুমার স্যারের কথাও বেশ ভালো মনে আছে। লম্বা-চওড়া, বলিষ্ঠ দেহ, মাথার মাঝখানে সিঁথি করে চুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁচড়ানো, চমৎকার করে ধোয়া সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বরের অধিকারী। ভারি সুন্দর করে পড়াতেন। সেকালের প্রথা অনুযায়ী প্রায়ই নোট দিতেন। নতুন কবিতা শুরু করার সময় প্রাথমিক দু'একটা কথা বলার পর বলতেন, হ্যাঁ, এবার লিখে নাও। আমরা তড়িঘড়ি খাতা খুলে লিখে নিতাম। কবি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য, কবিতার পটভূমি, তার সারমর্ম, তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় দিক কী কী ইত্যাদি। একটু বেশি সমাসবদ্ধ শব্দ এবং আলঙ্কারিক বাক্য ব্যবহার করতেন সুকুমার স্যার। পরে মনে হয়েছিল সে-রকম, বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়ি। কিন্তু স্কুলে পড়ার সময় স্যারের গুরুগম্ভীর ধ্বনিসমৃদ্ধ বাংলা আমাকে মুগ্ধ করত। সুকুমার স্যারের একটা ব্যতিক্রমী কাজের কথা মনে পড়লে আমি আজও অবাক হই। সিলেবাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি আমাদের একটি বিখ্যাত প্রাচীন, তারপর বাংলা অনুবাদ শোনাতেন। নাটকটি ছিল *মৃচ্ছকটিকা*।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলেজিয়েট স্কুলে

১৯৩৫-এ আমরা পিরোজপুর থেকে চলে আসি ঢাকায়। বাবার বদলির কারণে। বাবা বদলি হয়ে এসেছেন ঢাকা সদর দক্ষিণের মহকুমা হাকিম হয়ে। বাসা নেয়া হলো শরৎ চক্রবর্তী রোডে, মাহুতটুলিতে। আর্মানিটোলা স্কুলের কাছে। নতুন তৈরি সুন্দর দোতলা বাড়ি। নাম জোবেদা মহল। বেশ ক'বছর ছিলাম আমরা ওই বাড়িতে। আর্মানিটোলা স্কুল বাড়ির কাছেও হলেও আমরা দু'ভাই, আমি ও মুনীর, ভর্তি হলাম ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে।

বাসা থেকে স্কুলে বেশিরভাগ সময় হেঁটে যেতাম, মাঝে মাঝে ঘোড়ার গাড়িতে, ভাড়া দিতে হতো দু'আনা। তখন ঘোড়ার গাড়ি ছিল ঢাকার প্রধান যানবাহন। গাড়োয়ানরা ছিল, যাদের বলা হতো, কুট্টি সম্প্রদায়ের লোক। তারা বাংলা, উর্দু, হিন্দি মিশিয়ে এক বিচিত্র ভাষায় কথা বলত, অসামান্য ছিল তাদের চটজলদি মন্তব্য করার ক্ষমতা ও রসবোধ। ঢাকার ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে যাত্রীরা বাইরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসতেন ঘোড়ার গাড়ির খোঁজে, গন্তব্যে যাবার জন্য। এ প্রসঙ্গে সুপরিচিত একটি রসিকতা আছে। জনৈক যাত্রী ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করছে—কি হে, মাহুতটুলি যাবে নাকি? গাড়োয়ান জানালো, যামু না কেন, ছাব, যাওয়ানের লাইগাই তো আছি। তো, কত ভাড়া নেবে? আপনিই কন, ছাব। চলো তাহলে, দু'আনা পাবে। গাড়োয়ান প্রথমে নিজের মুখ ও তারপর নিজের কান চেপে ধরে, তারপর ঈষৎ নিচু গলায় বলে, কন কি ছাব, ঘোড়া ভি হাসবো!

পূর্ব বাংলার স্কুলগুলোর মধ্যে তার খুব নামডাক তখন। আর্মানিটোলা, পোগোজ, মুসলিম হাই, সেন্ট গ্রেগরিজ প্রভৃতিও তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে কলেজিয়েট স্কুলে পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল। সাধারণত হেঁটেই স্কুলে যেতাম। দূরত্ব খুব কম ছিল না। বাসা থেকে বেরিয়ে গলিপথ ধরে শর্টকাট করে গেলেও প্রায় মাইলখানেক হাঁটতে হতো; কিন্তু কোনো কষ্ট বোধ করতাম না। কালেভদ্রে, বিশেষ করে বৃষ্টিবাদলার দিনে, ঘোড়ার গাড়িতে যেতাম। দু'ঘোড়ায় টানা বাক্সের মতো গাড়িই তখন ঢাকার প্রধান যানবাহন। সামনে উঁচুতে কোচোয়ানের বসার জায়গা, গাড়ির ভেতরে মুখোমুখি দু'জন করে চারজন বসতে পারে, পেছনের পা-দানিতে একজন দাঁড়াতে পারে, আর প্রয়োজনবোধে কোচোয়ানের পাশে ঠাসাঠাসি করে একজন বসতেও পারে। ছাদে দড়ি দিয়ে বেঁধে ট্রাঙ্ক-বিছানা ইত্যাদি নেয়া যায়। এই ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া ছিল অবিশ্বাস্যরকম কম। আমরা মাহুতটুলি থেকে ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে আমাদের স্কুলে যেতাম তিন আনা দিয়ে, অর্থাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের দিনের বিশ পয়সার মতো। ভিক্টোরিয়া পার্ককে তখন স্থানীয় লোক বা সাধারণ মানুষ অনেক অনেক সময় বলত আণ্ডাগোড়ার ময়দান। পরে প্রশ্ন করে এই নামের একটা সম্ভাব্য কারণ আবিষ্কার করেছি, তবে তা সত্য নাও হতে পারে। ওখানে নাকি সাহেবেরা ঘোড়ায় চড়ে ডিমের মতো ছোট শাদা বল দিয়ে পোলোর ক্ষুদ্র সংস্করণের খেলা খেলতেন। সেই জন্যই ঘোড়ার অপভ্রংশ হয়ে আণ্ডাগোড়ার ময়দান। ওই পার্কেরই বর্তমান নাম বাহাদুর শাহ পার্ক, সিপাহি বিপ্লবের স্মৃতি ধারণ করে আছে তা।

এই ময়দানের মুখের সামনেই ছিল কলেজিয়েট স্কুলের ঐতিহ্যবাহী বিশাল দোতলা ভবনটি। এখন আর তা আগের খান্দানী ভারিক্কি রূপ নিয়ে সে অবস্থায় নেই।

ঢাকায় কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল ভবন, তার বড় বড় স্তম্ভ, দোতলায় উঠে যাবার জন্য চওড়া কাঠের সিঁড়ি, ঘোরানো বারান্দা, শ্রেণী কক্ষের আকার ইত্যাদি দেখে মনের মধ্যে একটা চমক লাগে।

আমাদের স্কুলের অসম্ভব মোটা থামগুলো প্রথম দিনই আমার কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দোতলায় উঠবার সিঁড়ি ছিল খুব প্রশস্ত, আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাভবনে মধুর ক্যান্টিনের দিক থেকে দোতলায় উঠবার যে সিঁড়ি তার অন্তত চারগুণ বেশি চওড়া ছিল আমাদের স্কুলের ওই সিঁড়ি। আর সিঁড়ি ছিল কাঠের।

আমাদের স্কুলের নাতিদূরেই ছিল বুড়িগঙ্গা নদী। বেশ বড় নদী, চমৎকার টলটলে প্রবহমান স্রোত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনমান কত ধরনের নৌকা তার ওপর দিয়ে দু'দিকে বয়ে চলে ছোট পানসি নৌকা, ছইওয়ালা বড় বজরা নৌকা, কোনো কোনো বজরার নিচের তলায় বসবার জন্য জানালার পাশের বেঞ্চি ছাড়াও চেয়ার টেবিল আছে, আর দোতলায়ও ঘেরদেয়া জায়গায় চেয়ার টেবিল আরামকেদারাসহ আছে আরাম করার বিবিধ সুব্যবস্থা। বুড়িগঙ্গার এপারে হলো ঢাকার নবাববাড়ি, আহসান মঞ্জিল, আর ওপারে বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য এলাকা, যার নাম জিঞ্জিরা। এপারে, অর্থাৎ ঢাকার দিকে, নদীতীর ছিল চমৎকার ইট-সিমেন্ট দিয়ে বাঁধাই করা, নাম ছিল বাকল্যান্ড বাঁধ, একটু পর পরই বসবার জন্য পাকা বেঞ্চ, পেছনে হেলান দেবার ব্যবস্থা আছে, দু'পাশে হাতলেরও। বুড়িগঙ্গার তীর ছিল সেদিনের ঢাকাবাসীর অন্যতম বেড়াবার জায়গা। তারা সকালে-বিকালে প্রভাতী ও সান্ধ্যভ্রমণের জন্য দলে দলে বুড়িগঙ্গার তীরে আসতেন, সব বয়সের মানুষ, কিশোররা থেকে যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধরা পর্যন্ত। তবে মেয়েদের দেখা যেত না, গেলেও কদাচিৎ। বুড়িগঙ্গায় আমার কৈশোরকালে আমি যে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখেছি তার কথা কখনো ভুলব না। লম্বা লম্বা নৌকা, বিশ-বাইশ জন করে মাল্লা, অপূর্ব ছন্দে তারা বলিষ্ঠ হাতে তাদের বৈঠা চালায়, বুড়িগঙ্গার স্বচ্ছ জল কেটে নৌকা ছুটে চলে তীরের বেগে, কূলে দাঁড়িয়ে যার যার নৌকার সমর্থকরা চিৎকার করে, নানা রকম ধ্বনি তুলে, ঢোল বাজিয়ে তাদের নৌকার মাল্লাদের উৎসাহ দিতে থাকেন। কোথায় গেল সেই নৌকা বাইচ। আজ কী হাল হয়েছে বুড়িগঙ্গা নদীর। বুড়িগঙ্গার এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করুণ হাল দেখেই "চারশো বছরের ঢাকা" উৎসব উদযাপনের জন্য গঠিত নাগরিক কমিটি তাদের স্লোগান নির্বাচন করেছে "বুড়িগঙ্গা ঢাকার প্রাণ, বুড়িগঙ্গাকে আমরা বাঁচাবোই।"

অষ্টম শ্রেণী ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল আমাকে। জনাবিশেক ছিলাম আমরা। ভর্তি করা হবে মাত্র চারজনকে। লিখিত পরীক্ষা। অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলা ও সাধারণ জ্ঞান। ভয়ে বুক দুরু দুরু করছিল। মফস্বল থেকে এসেছি আমি। ঢাকা শহরের স্মার্ট ছেলেদের চালচলনই আলাদা, যেন চোখেমুখে কথা বলছে। ভর্তি হতে যদি না পারি? শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কানের পাশ ঘেঁষে গুলি চলে গেছে। ভর্তি পরীক্ষায় চতুর্থ হয়েছি, নার্ভাসনেসের জন্য ঠিকমতো উত্তর লিখতে পারিনি, নইলে সব প্রশ্নের উত্তরই জানতাম। পরে পড়াশোনার পদ্ধতিটা ঠিকমতো রপ্ত হয়ে যাওয়ার পর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বার্ষিক পরীক্ষা দিই, আজ যে পরীক্ষার নাম এসএসসি পরীক্ষা। ঢাকা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা হয়। তখন সারা পূর্ব বাংলায় একটা বোর্ডই ছিল। ম্যাট্রিকে আমি মেধা তালিকায় সপ্তম স্থান অধিকার করি। এর পেছনে স্কুলের শিক্ষকদের অবদান ছিল অনেকখানি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার ফুট নয় ইঞ্চি টুর্নামেন্ট

স্কুলজীবনের বহু টুকরো টুকরো স্মৃতি আজও মনে উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে। তার মধ্যে একটা হলো ওয়ার্কশপে কাজ করার স্মৃতি। স্কুলের মূল ভবন থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত ছিল টিনের ছাদওয়ালা একটা লম্বা ধাঁচের চালাঘর। সেখানে কিছু যন্ত্রপাতি ও কয়েকটা টেবিল ছিল। করাত, র‍্যাঁদা, তুরপুণ, ছুরি, শিরিষ কাগজ, আঠা ইত্যাদি সরঞ্জামে সজ্জিত ওই ওয়ার্কশপে আমরা উপরের ক্লাসের ছাত্ররা সপ্তাহে দু'দিন কাজ করতাম, ছোটখাটো কাঠের জিনিস বানাতাম।

এর জন্য কোনো নম্বর ছিল কিনা তা স্পষ্ট মনে নেই, তবে ওই ক্লাস করা ছিল বাধ্যতামূলক। আমার ভালোই লাগত। মনে আছে দুপুরের বিরতির সময় টিফিনের ব্যবস্থার কথা। স্কুল থেকে টিফিন দেয়া হতো। প্রায়ই রুটি-তরকারি। ওই সময়ে ঢাকার কয়েকটা স্কুলে ছাত্রদেরকে দুপুরের টিফিন দেয়ার রেওয়াজ ছিল। এজন্য, সম্ভবত, বেতনের সঙ্গে সামান্য কিছু বাড়তি অর্থ দিতে হতো, তবে স্কুল ভালো অঙ্কের ভর্তুকি দিত, তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না হলে ওই ব্যবস্থা চালু থাকতে পারত না। টিফিন হিসাবে সাধারণত দেয়া হতো কোনো দিন দুটো রসগোল্লা অথবা ওই জাতীয় কোনো মিষ্টি, কোনো দিন রুটি অথবা লুচি এবং সঙ্গে একটুখানি নিরামিষ তরকারি। আমরা ছাত্ররা স্কুলের সামনের মাঠে শ্রেণী অনুযায়ী সারি বেঁধে দাঁড়াতাম বা বসতাম, দু'জন পিওন ঝকঝক করে মাঝা পিতলের বালতি এবং পিতলের বড় চ্যাপ্টা চামচ নিয়ে টিফিন পরিবেশন করত, একজন শিক্ষক তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতেন ও সব কিছু তদারক করতেন।

টিফিন নিয়েই আমরা লাইন থেকে সরে গিয়ে মাঠের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে খেয়ে নিতাম। সতর্ক থাকতে হতো যেন কাক, চিল বা অন্য কোনো পাখি ছোঁ মেরে হাত থেকে খাবার ছিনিয়ে না নেয়। টিফিনের সময়টায় ছাত্রদের হৈ-হল্লা ও চেঁচামেচির সঙ্গে পাখিদের তীক্ষ্ণ ডাক অবধারিতভাবে মিশে যেত। রুটি-তরকারি ছাড়াও মাঝে-মাঝে টিফিন পেতাম কলা, কমলা, ডালপুরি, মিষ্টি।

আরো একটি মজার স্মৃতি আছে, তাহলো খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে। তখন ঢাকার সব স্কুলেই সংলগ্ন খেলার মাঠ ছিল, তবে তা ছিল আকারে ছোট, সেখানে অনুশীলনের কাজ ভালো চললেও সে-মাঠ প্রতিযোগিতামূলক খেলার জন্য উপযুক্ত ছিল না। তাই আন্তঃস্কুল বা ওই রকম প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশ নিতে হলে আমাদের পল্টনের বড় কোনো ক্লাবের খেলার মাঠ ব্যবহার করার অনুমতি নিতে হতো। স্কুল কর্তৃকপক্ষ ক্লাবগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা করতেন। সেই সময় বড় ক্লাবগুলির মধ্যে ছিল ওয়ারী স্পোর্টিং ক্লাব, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব প্রভৃতি। তাদের নিজস্ব খেলার মাঠ ছিল, সেদিনের প্রশস্ত পল্টন অঞ্চলে, ছোট হলেও ওই সব ক্লাবের প্যাভিলিয়ন ও ক্লাবঘরও ছিল। আর তখন ফুটবলই প্রধান খেলা ছিল, আর ফুটবলের চাইতে কম খেলা হলেও হকিও তখন বেশ খেলা হতো। আমি হকি খেলেছি নবাববাড়ি আহসান মঞ্জিলের সামনের মাঠে। মাহুতটুলি থেকে আমি আর আমার পাড়ার এক বন্ধু বেশ খানিকটা হেঁটে ওই মাঠে হকি খেলতে যেতাম। তখন বড়দের হকি খেলায় একজন খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন, তার নাম আজও আমার মনে আছে, ইউসুফ রেজা। আমার ছেলেবেলায় হকি খেলার আগ্রহ আমি পরবর্তীকালেও বজায় রাখি এবং ১৯৪০-৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয় হকি একাদশে জায়গা করে নিতে সক্ষম হই। সেই সময় হকি ব্লু হওয়ার স্মৃতি আজও আমাকে আনন্দ দেয়।

কিন্তু আমি বলতে চেয়েছিলাম ফুটবলের কথা। সে প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। কলেজিয়েট স্কুলে খেলাধুলার ওপর বেশ জোর দেয়া হতো। আমি স্কুলের ফুটবল দলে নিয়মিত খেলতাম। তখন ফুটবল মৌসুমে একটা কৌতূহলোদ্দীপক আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতা হতো। তার নাম ছিল "চার ফুট নয় ইঞ্চি টুর্নামেন্ট"। তার অর্থ, কোনো ছাত্রকে ওই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে হলে তার দৈহিক উচ্চতা ৪ ফুট ৯ ইঞ্চির মধ্যে থাকতে হবে, এর উর্ধ্বে তার উচ্চতা সামান্য ভগ্নাংশ বেশি হলেও অযোগ্য ঘোষিত হবে। মাঠের এক পাশে উচ্চতা মাপার যন্ত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসানো থাকত, খেলার আগে সেখানে সকল প্রতিযোগী ছাত্রের উচ্চতা পরীক্ষিত হতো এবং তার ফলাফল অনুযায়ী তাকে পাস বা ফেল ঘোষণা করা হতো। আমার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হতো না, আমি অনেকটা বেঁটের দিকেই ছিলাম, তবে আমাদের দলের দু'জনের পরিস্থিতি ছিল প্রান্তিক, তারা কোমর শক্ত করে বেল্ট বেঁধে, ঘাড় ছোট করে ও আরো নানা উপায়ে নিজেদের উচ্চতা যথাসম্ভব কম করে দেখাবার চেষ্টা করত। সেই সব সময়ের বহু মজার অভিজ্ঞতার স্মৃতি আজও মাঝে মাঝে আমার মনে দোলা দেয়।

ম্যাচের দিন আমরা খেলোয়াড়রা সবাই স্কুলে একত্র হয়ে সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে নবাবপুর হয়ে খেলার মাঠে আসতাম। তিন-চারটা গাড়ি করে আসলেও খরচ এক টাকার বেশি পড়তো না। ম্যাচের পর হারজিত যাই হোক, নিজ নিজ স্কুলের পক্ষ থেকে আপ্যায়ন করা হতো। আমরা মাঠ থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে নবাবপুর রেলক্রসিং পার হয়ে ঠিক মোড়ের কাছে একটা দোকানে এসে জমায়েত হতাম। সারা গা ঘামে ভিজে সপসপ। কেউ পায়ে ব্যথা পেয়েছে, ল্যাংচাচ্ছে। তবু খেলা নিয়ে কী তুমুল আলোচনা। জিতলে সবার মুখে হাসি ও সানন্দ উত্তেজনা। যে গোল করেছে বা অনবদ্য পাস দিয়েছে বা কঠিন গোল থামিয়েছে তার মুখে ঈষৎ গর্বের ভাব। আর হারলে পর সবার মুখ ভারি, থমথমে, বিষণ্ন। ক্রীড়া শিক্ষকের সান্ত্বনা দান সত্ত্বেও সবাই কেমন চুপচাপ। খাওয়া-শেষে সবাই যে যার বাড়ির পথে। এবার আর এক সাথে নয়, তবে একদিকে বাড়ি পড়লে একসঙ্গে কিছুদূর যাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেত। খেতাম বড় এক গ্লাস করে ঘোলের শরবত, প্রচুর বরফ দেয়া। কী অপূর্ব যে লাগত। নবাবপুরের প্রান্তসীমায় অবস্থিত ওই দোকানের ঘোলের শরবত ছিল বিখ্যাত। শরবত ছাড়া দেয়া হতো হয় একটা শিঙ্গাড়া কিংবা নিমকি কিংবা রসগোল্লা। ওই ছিল মাথাপিছু বরাদ্দ। কিন্তু সেই খাওয়া আর খেলার পর বিচার-বিশ্লেষণ আর সমালোচনা, আর আগামী খেলার প্রস্তুতি আর সম্ভাব্য কৌশল নিয়ে ভাবনা-চিন্তা।

আজ যেখানে ঢাকা স্টেডিয়াম সে অঞ্চলেই ছিল আমাদের সেদিনের খেলার মাঠ। এমনিতে আমরা স্কুল প্রাঙ্গণেই খেলতাম কিন্তু প্রতিযোগিতার খেলা হতো পুরানা পল্টনের নির্ধারিত মাঠে।

কলেজিয়েট স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে অমল, সুশীল আর অজিতের সঙ্গে সাতচল্লিশে উপমহাদেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর আর দেখা হয়নি। হিমাংশুরা অনেকদিন পর্যন্ত ঢাকাতেই ছিল, পরে সেও কলকাতায় চলে যায়। সে ছিল আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি যখন ১৯৭২ সালে কলকাতায় যাই তখন ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ও তখন ভীষণ অসুস্থ, প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী। হিমাংশুর কথা পরে বড় করে বলব।

সুশীল ছিল খুব চটপটে। একদিন ক্লাসে গিয়ে দেখি ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে সে চক দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লিখছে : শীলা চঞ্চল, দিদি চঞ্চল!! তখনো ঘন্টা পড়েনি, স্কুল বসার একটু দেরি আছে। শিক্ষক ঘরে ঢুকবার আগেই সে লেখা মুছে ফেলল। কে শীলা, কে দিদি, কেনই-বা তারা চঞ্চল আমি কিছুই বুঝলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিফিনের সময় রহস্যটা পরিষ্কার হলো। সুশীলই বুঝিয়ে দিল। ঢাকাতে নিউ থিয়েটারের নতুন সাড়া জাগানো ছায়াছবি এসেছে, *দিদি*। ছোট বোনের নাম শীলা। সুন্দরী, চঞ্চল, দিদির পরম আদরের ধন, পিতৃমাতৃহীন। শীলার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নবাগত লালীদেশাই। আর দিদি হলেন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী চন্দ্রাবতী। বিরাট কারখানার মালিক এবং তার ব্যবস্থাপনা পরিষদের প্রেসিডেন্ট। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী কিন্তু তাঁর চিত্তেও চাঞ্চল্য জাগায় কারখানার এক শ্রমিক কর্মী। সে-ই নায়ক। তার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, সে যুগের অসামান্য জনপ্রিয় গায়ক অভিনেতা, কে এল সায়গল। দু'বোনই প্রেমে পড়ে তার, কিন্তু দিদির ভালোবাসার কথা লুকানোই থাকে। এই ছবির কথাই সুশীল তার সাঙ্কেতিক ভাষায় সহপাঠীদের জানিয়ে দিতে চেয়েছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিউ থিয়েটার্সে ম্যাটিনি শো

কৈশোর-যৌবনের বয়ঃসন্ধিতে দেখা নায়িকা শীলা দেশাইয়ের কথা ভুলতেই পারছি না। একদিন টিফিনের গোটা সময়জুড়ে সুশীলের মুখে শুধু *দিদি* চলচ্চিত্রের গল্প। কয়েকদিন পর আমি *দিদি* দেখলাম।

সিনেমা আমরা সেসময় খুব সহজে নিরুদ্বেগ চিত্তে দেখার সুযোগ পেতাম না। বাড়িতে ব্যাপারটা মোটেই উৎসাহিত করা হতো না। এ ব্যাপারে বাবা ছিলেন বেশ কড়া। তবে তাঁর অজান্তে মায়ের কাছ থেকে কাকুতি-মিনতি করে অনুমতি আদায় করে কিছু-কিছু ছবি তখন দেখেছি দুপুরে, ম্যাটিনি শো'তে। নিউ থিয়েটার্সের স্বর্ণযুগের সেসব ছবির কথা আজও ভুলতে পারি না। আর কী প্রতিভাদীপ্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমারোহ। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়াদেবী, চন্দ্রাবতী, জীবন গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, প্রমথেশ বড়ুয়া, যমুনা, মলিনা, কানন দেবী, অমর মল্লিক, জহর গাঙ্গুলী, মেনকা। বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করার আগেই ছাত্রজীবনের দেখা যেসব চলচ্চিত্রের স্মৃতি এখনো পুরোপুরি না হলেও অনেকটা মনে আছে তার মধ্যে রয়েছে *দিদি*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানময়ী গার্লস স্কুল, *বিদ্যাপতি*, *মুক্তি*, *দেশের মাটি*, *সাপুড়ে*, *গৃহদাহ*, *দেবদাস*, *অধিকার*, *সাথী*, *রজতজয়ন্তী* প্রভৃতি। *বিদ্যাপতি* আর *সাপুড়ে* এ দুটি চলচ্চিত্রের কাহিনী রচনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাছাড়া তিনি গানও লিখেছিলেন, সুর দিয়েছিলেন, শিল্পীদের গান শিখিয়েছিলেন পরম যত্ন নিয়ে। ওই দুটি ছবির পরিচালক ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা দেবকীকুমার বসু। অভিনয় প্রসঙ্গে আজও মনে আছে বিদ্যাপতিতে নাম ভূমিকায় পাহাড়ী স্যানাল, রানী লছমির ভূমিকার ছায়া দেবী ও অনুরাধার ভূমিকায় কানন দেবীর মন-মাতানো অভিনয়ের কথা। *সাপুড়ে*তেও নায়িকার ভূমিকায় ছিলেন কাননদেবী আর সাপুড়েসর্দারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অসামান্য শক্তিশালী শিল্পী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। বিদ্যাপতির গাওয়া তাঁর *অঙ্গনে আওভ যব রসিয়া* গানটিতে তিনি যে আবহ সৃষ্টি করেছিলেন তা ভোলবার নয়। *সাপুড়ে*তে গাওয়া *আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়* ওই সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়। শেষের গানটি নজরুল যখন কানন দেবীকে শেখান সে-কথা বলতে গিয়ে বহুদিন পর কাননবালা লিখেছেন :

> "শেখাতে শেখাতে বলতেন, মনে মনে ছবি এঁকে নাও নীল আকাশ দিগন্তে ছড়িয়ে আছে। তার কোনো সীমা নেই, দু'দিকে ছড়ানো তো ছড়ানোই। পাহাড় যেন নিশ্চিন্ত মনে তারই গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে। আকাশের উদারতার বুকে এই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোনোটা প্রকাশ করতে হলে সুরের মধ্যেও একটা আয়েশ আনতে হবে। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু ডাটিয়ালির ভাব দিয়েছি। আবার ঐ পাহাড় ফেটে যে ঝরনা বেরিয়ে আসতে তার চঞ্চল আনন্দ কেমন করে ফোটাবে? সেখানে সাদামাটা সুর চলবে না। একটা গীটকিরী গানের ছোঁয়া চাই। তাই ও-ও-অই বলে ছুটলো ঝরনার আত্মহারা আনন্দে। এমনই করে তিনি এই মেলানোর আনন্দ আমাদের হৃদয়েও যেন ছড়িয়ে দিতেন।"

এই যে উপরে যেসব কথা লিখলাম এসব কিন্তু সেদিন ত্রিশের দশকের শেষ দিকে জানতাম না। এতসব সূক্ষ্ম বিষয় বুঝতামও না। তবু একেবারে কিছুই যে বুঝতাম না তাও ঠিক নয়। বেশ মনে আছে যে প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি রজতজয়ন্তী সে সময় হাসির ছবির ক্ষেত্রে একটা বুদ্ধিদীপ্ত পরিশীলিত দিক-নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করেছিল। ছবির নাম দেখে ভেবেছিলাম রজতজয়ন্তী বুঝি ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জের শাসনকালের জয়ন্তী নিয়ে কোনো ছবি। কিন্তু বড়ুয়া সাহেব কি ওরকম ছবি করবেন? ছবিটি দেখার পর বুঝলাম যে ছবির সঙ্গে পঞ্চম জর্জের কোনো সম্পর্ক নেই। নায়ক-নায়িকার নামে ছবির নাম রাখা হয়েছে। রজত ও জয়ন্তী। অনাবিল সুন্দর আনন্দদায়ক হাসির ছবি। পরবর্তী সময়ে আরো বাংলা হাসির ছবি দেখেছি কিন্তু রজতজয়ন্তীর ব্যতিক্রমী চরিত্রের কথা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। স্কুলজীবনে সিনেমা দেখা প্রসঙ্গে আরেকটা মজার ঘটনার উল্লেখ করি। ব্যাপারটা ছিল একদিক থেকে করুণও। আমি আর মুনীর ম্যাটিনি শো দেখতে গিয়েছি মুকুল সিনেমায়। ঢাকাতে তখন যতদূর মনে পড়ছে মাত্র পাঁচটি সিনেমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো ছিল। 'মুকুল', 'রূপমহল', 'লায়ন সিনেমা', 'পিকচার প্যালেস'। আর রমনা অঞ্চলে ছিল 'ব্রিটানিয়া'।

ওই হলেই আমি ও আমার ছোট ভাই মুনীর অনেক ইংরেজি ছবি দেখেছি। বহু প্রসিদ্ধ তারকার অভিনয় দেখে চমৎকৃত হয়েছি : রবার্ট টেইলর, ক্লার্ক গেবল, স্পেন্সার ট্রেসি, এরল ফ্লিন, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, মার্লিন ডিয়েট্রিচ, বেটি ডেভিস, গ্রেটা গার্বো, মেরিলিন মুনরো, জোন ফন্টেইন, এবং আরো কত কত অভিনেতা-অভিনেত্রী। ওই সিনেমা হলটির নাম ছিল 'ব্রিটানিকা'। এখনই ওই রকম নাম খুব হাস্যকর মনে হয়। তখন কিন্তু কোনো কিছুই মনে হয়নি।

ব্রিটানিকায় দর্শক সংখ্যা খুব অল্প হতো। এখন ভাবি কেমন করে মালিক তার ব্যবসা চালাতেন। নিশ্চয়ই তার আয়ের অন্য উৎস ছিল। এটা ছিল তার একান্ত শখের কারবার। ব্রিটানিকাতে সিনেমা দেখতে গিয়ে একদিন একটা মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেদিন আবহাওয়া ভালো ছিল না। আকাশে ঘন মেঘ, মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সিনেমা দেখতে এসেছি আমি ও মুনীরসহ সর্বসাকল্যে পাঁচজন। ছবি শুরু হবার নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট আগে মালিকের প্রতিনিধি আমাদের সামনে এসে করজোড়ে বললেন, আজ শো হবে না, আমরা যেন তাদের ক্ষমা করে দিই, পাঁচজন দর্শক খুবই কম সংখ্যক, এই টিকিট দিয়েই আমরা পরবর্তী যে কোনো দিন যে কোনো শো দেখতে পারব। কী আর করা, আমরা হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিলাম। সেদিন কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিনেমা ছিল মনে নেই কিন্তু নাম করা একটা ফিল্ম যে ছিল, সে কথা বেশ মনে আছে।

সেখানে শুধু ইংরেজি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হতো। যাই হোক আমি আর মুনীর মুকুলে *মুক্তি* ছবি দেখতে গিয়েছি। নিউ থিয়েটার্সের নতুন সাড়া জাগানো ছবি। আমাদের টিকিট কাটতে হয়নি। বাবা ঢাকা সদরের মহকুমা হাকিম হওয়ার সুবাদে পাস নিয়ে ছবি দেখতে ঢুকেছি। ভারি ভালো লেগেছিল। প্রমথেশ বড়ুয়া নায়ক, একজন চিত্রশিল্পী। নায়িকা কানন দেবী, বড়লোকের মেয়ে। কাহিনী, উপস্থাপনভঙ্গি, সংলাপ, ক্যামেরার কাজ, গান, পটভূমি নির্মাণ, অভিনয়, সবকিছুতে প্রমথেশ বড়ুয়ার সুরুচি, নিরীক্ষাপ্রবণতা ও কারিগরি নৈপুণ্যের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। সুন্দরভাবে ওই ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহৃত হয়েছিল। শহর থেকে অনেক দূরে পাহাড়ি অরণ্য অঞ্চলে বাস করা এক সাধারণ মানুষের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক। *দিনের শেষে ঘুমের দেশের* সেই বিখ্যাত গানটি পঙ্কজ মল্লিক অত্যন্ত আবেদনময়ভাবে পরিবেশন করেছিলেন ওই ছবিতে। মুনীর আর আমি তন্ময় হয়ে ছবি দেখেছিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝেই একটা দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা ও ভয় সব আনন্দ চুরমার করে ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের অস্থির করে তুলছিল। *মুক্তি* বেশ বড় ছবি। বোধহয় পাকা তিন ঘণ্টার। তখন ছিল শীতকাল। দিন ছোট। ছবি শেষ হতে হতে সন্ধ্যা নেমে যাবে। আমাদের বাসা সেই মাহুতটুলিতে। সন্ধ্যার মধ্যে বাসায় পৌঁছতেই হবে। এ আইনের কোনো ব্যতিক্রম নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার আগে পর্যন্ত আমাদের হোটবেলার এই নিয়ম ছিল অলঙ্ঘনীয়। তাই ছবির শেষার্ধে আনুমানিক সাত আট মিনিট পরপরই হয় আমি নয় মুনীর আসন ছেড়ে বাইরে এসে হলের প্রবেশ পথের ওপর দিকে দেয়ালে টানানো ঘড়ি দেখছিলাম। তখন আমাদের নিজের হাতঘড়ি থাকার প্রশ্নই ছিল না। সেটা অবাঞ্ছিত বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ত। আমাদেরকে ওইভাবে একটু পরপর হলো ছেড়ে বাইরে বেরুতে দেখে গেটকিপার ব্যাপার কী জানতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা জরুরি কাজ আছে। একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে বাসায় অবশ্যই পৌছতে হবে সেদিন শেষ পর্যন্ত মুক্তি আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ দেখা সম্ভব হয়নি। মিনিট দশেকের মতো বাকি থাকতেই আমরা দু'ভাই হলো থেকে বেরিয়ে প্রায় দৌড়ে সেই জনসন রোড থেকে মাহুতটুলির শরৎ চক্রবর্তী রোডে এসে পৌছাই। ভাগ্য প্রসন্ন। সন্ধ্যা হয়ে গেলেও বাবা তখনো মাগরেবের নামাজ শেষ করে কাছে পরীবাগের শাহ সাহেবের মসজিদ থেকে বাসায় ফিরে আসেননি। আমরা ঝটপট কাপড়জামা বদলে বইপত্র নিয়ে যে যার পড়ার জায়গায় বসে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলেজিয়েট স্কুলের সহপাঠীরা

কলেজিয়েট স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে কয়েকজনের কথা বেশ ভালো মনে আছে। তাদের কেউ কেউ এখন বেঁচে নেই, কারো-কারো সঙ্গে আটত্রিশ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার পর আর দেখা হয়নি, আবার কারো-কারো সঙ্গে দেখা হয়েছে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় এবং তারো পরে, আমি যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেছি তখন, বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন সূত্রে। এই শেষের দলের মধ্যে নাজির আহমেদ আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ওর গোটা পরিবারেরই একজন কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলাম আমি। নাজির ছিল সেকালের ঢাকার সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব মীর্জা আবদুল কাদেরের ভ্রাতুষ্পুত্র। কাদের সর্দার তখন বেসরকারি নগর প্রশাসনের অন্যতম স্তম্ভ, নাটক-সঙ্গীত-চলচ্চিত্র প্রভৃতির উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক, নেপথ্যে থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রেও সক্রিয়। ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াসহ সকল কাজে তিনি তাঁর স্নেহের উদার হাত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। নাজিরের বড় ভাই নাসির আহমেদকে আমি নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো দেখতাম। নাজিরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট ভাই চিত্রশিল্পী হামিদুর রহমান ও নাট্যকার সাঈদ আহমেদ ছিল আমার ছোট ভাইয়ের মতো। ওদের মধ্যে একমাত্র সাঈদ আহমেদ ছাড়া আজ আর কেউ বেঁচে নেই। আমার সহপাঠী বন্ধু নাজির মারা গেল এই সেদিন।

স্কুল ছাড়ার পর নাজিরকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়েও পাই। সে তখন শৌখিন মঞ্চাভিনেতা হিসেবে রীতিমতো বিখ্যাত। এটা হলো ১৯৪৩-৪৪ সালের কথা। তখন ঢাকায় কোনো প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা ছিল না। তবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে এবং দু'চারটি মহল্লার ক্লাবের উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে বার্ষিক নাটক মঞ্চস্থ হতো। অবধারিতভাবে শীত মৌসুমে। কেউ কেউ তাদের অভিনয় নৈপুণ্যের গুণে নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে গিয়ে অন্যত্রও অতিথি অভিনেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করত। চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধেই নাজির আহমেদ একজন শক্তিশালী ব্যতিক্রমী আঙ্গিকের অভিনেতা হিসেবে নিজের জন্য একটা বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছিল। সে সময় বহু নাটকে অভিনয় করে হাবিবুল হক (বাবু ভাই), মুজিবুর রহমান খান, আব্দুল খালেকও সুনাম অর্জন করেছিলেন। তখন ঢাকায় অভিনীত হতো কলকাতার মঞ্চসফল বিধায়ক ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাল রায়, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত প্রমুখের জনপ্রিয় নাটকগুলো। নার্সিং হোম নামক একটি নাটকে নাজির প্রধান চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছিল। পরে যখন এসব বিষয়ে আরেকটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ ঘটে তখন বুঝতে পারি যে সে সময় নাজিরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিনয়ভঙ্গির ওপর অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়কলার উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছিল; কিন্তু নাজির ধীরে ধীরে একটা স্বকীয় ঢঙ-ও তৈরি করে নিয়েছিল।

১৯৪৪-এ আমি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করি। তারপর নাজিরের সঙ্গে আবার দেখা হয় কলকাতায়। খুব সম্ভব ১৯৪৫-এর জুন মাসে। তখন সে অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা বেতার কেন্দ্রে চাকরি করছে। আদি ঢাকার মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের একটা বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে সেদিনের ওই পরিবেশে কেমন করে শুধু নিজের গুণে কলকাতা বেতারের মতো উন্নাসিক একটি প্রতিষ্ঠানে নিজের জন্য সম্মানের স্থান অধিকার করে নিতে পেরেছিল সেকথা ভাবতে আজও আমার অবাক লাগে। নাজিরের বাচনভঙ্গি ছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কথার মধ্যে ঝোঁক ও বিরতিদানের ক্ষেত্রে সে ছিল দক্ষ। তার শরীরের গড়ন ছিল হালকা-পাতলা, কিন্তু কণ্ঠস্বরটি ছিল ভরাট। বক্তব্য বিষয় ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে ওই কণ্ঠস্বরকে আকর্ষণীয়ভাবে ওঠাতে-নামাতে পারত, পারত তাকে তীক্ষ্ণ বা কেমল করে তুলতে। সোনালি কণ্ঠস্বরের বালক অভিধাটি সে তার কলকাতার বেতার জীবনেই অর্জন করে ফেলেছিল। ভারতীয় বেতারের অন্যতম কর্মকর্তা প্রখ্যাত জেড. এ. বোখারীর বিশেষ স্নেহভাজন ছিল নাজির। নাজির আমাকে একদিন বোখারী সাহেবের ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি এবং তাঁর তরুণী কন্যা নাজিরের সঙ্গে নিজেদের পরিবারের একজন সদস্যের মতো আচরণ করেছিলেন এবং নাজিরের বন্ধুরূপে আমার সঙ্গেও। আমি তখন সরকারি চাকরিতে যোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছি। এমন একটা চাকরি যার সঙ্গে কবিতা-নাটক-সঙ্গীত কেন, কোনোরকম শিল্পকলারই, ক্ষীণতম যোগ নেই। কিন্তু যে চাকরিই করি না কেন অন্তর তাগিদেই আমি সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে প্রথম থেকেই ঘনিষ্ঠ সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলাম। সে যোগাযোগ আজ অবধি শুধু অক্ষুণ্ন থাকেনি, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৪৭-এ উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর ঢাকা বেতারকে নতুনভাবে সংগঠিত করার কাজে নাজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষভাবে বেতারের নাট্যশাখাটিকে একটা শক্ত ভূমিতে দাঁড় করাবার জন্য সে প্রভূত পরিশ্রম করেছিল। সে সময় অবশ্য আমার চাইতে আমার ছোট ভাই মুনীরের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। মুনীরকে দিয়ে নাজির ঢাকা বেতারের জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক অণু-নাটক লিখিয়ে নিয়েছিল।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও নাজির আহমেদের তাৎপর্যময় অবদান ছিল। নাজিরের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় ১৯৭৬ সালে। লন্ডনের বুশ হাউসে, বিবিসি কেন্দ্রে। সে তখন সস্ত্রীক যুক্তরাজ্যে বাস করছে। এক রকম স্থায়ীভাবেই। বিবিসির বাংলা বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তার। মাঝে-মধ্যে অনুষ্ঠানও করত, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিত। বহুদিন পর পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে বিদেশের মাটিতে দেখা হয়ে ভীষণ ভালো লেগেছিল। বুশ হাউসের রেস্তরাঁয় বসে কফি খেতে খেতে বোধহয় দু'তিন ঘণ্টা আন্তর্জাতিক শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের নানা গল্পে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। নাজির ছাড়াও ওই আড্ডায় এসে যোগ দিয়েছিল, সারাক্ষণ না হলেও ছাড়াছাড়াভাবে—কিছু সময়ের জন্য, সিরাজুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, নুরুল ইসলাম, কমল বোস, শ্যামল লোধ, দীপঙ্কর।

কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রজীবনের কথা বলতে গিয়ে নাজিরের প্রসঙ্গ ধরে অন্য অনেক স্মৃতিচারণ হয়ে গেল। এবার আবার ত্রিশের দশকের শেষ ক'বছরে ফিরে যাই। কলেজিয়েট স্কুল আর ঢাকা কলেজের ছাত্রজীবনের দিনগুলোতে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয় হিমাংশু

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে আমার সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল হিমাংশু নারায়ণ দত্ত নামক একটি হিন্দু ছেলের সঙ্গে। আমার বাবা ছিলেন আচারনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মুসলমান। পাঁচ ওয়াক্ত ঠিক সময়ে নামাজ পড়তেন, যখনই সম্ভব হতো মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করতেন, চিরজীবন আচকান-পাজামা পরেছেন, মাথায় টুপি দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তাঁর ছেলেবেলায় অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী ও বিদ্যানুরাগী কতিপয় হিন্দু প্রতিবেশী ভদ্রলোকের কাছ থেকে তিনি তাঁর ছাত্রজীবনে যে সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করেছিলেন সেকথা বাবার মুখে বহুবার শুনেছি। হিমাংশু যখন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে, আমাদের বাসায় প্রায় প্রতিদিনই আসছে, আমিও যাচ্ছি তার বাসায়, ওর মা-বাবা-ভাইবোনের কাছে একজন অতি পরিচিতজন হয়ে উঠেছি আমি, তখন তা নিয়ে আমার বাবা কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হননি। আমার মা অবশ্য হিমাংশুর সামনে খুব আসতেন না। পর্দা করতেন তিনি। তবে হিমাংশু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে শুনলেই তার জন্য ভেতর থেকে মা খাবার পাঠিয়ে দিতেন। আর আমি হিমাংশুর বাড়িতে খেয়েছি খুবই অন্তরঙ্গ পরিবেশে। ওর মা, মাথায় ঘোমটা, কপালে লাল সিঁদুরের টিপ, নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করেছেন আমাকে।

হিমাংশুদের বাসা ছিল নবাবপুরে। এক সময় ওদের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল; কিন্তু ত্রিশের দশকের শেষদিকে পড়তির মুখে। বাবা কবিরাজ, তখনও কবিরাজি করেন, কিন্তু আর তা থেকে বিশেষ কিছু রোজগার হয় না। অর্থনৈতিক কারণেই হিমাংশু ইন্টারমিডিয়েটের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারেনি। অথচ ও ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, মেধাবী, কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, আর প্রচণ্ড আত্মমর্যাদার অধিকারী। দারিদ্র্যের সঙ্গে সারা জীবন সংগ্রাম করেছে, একটার পর একটা ঝড় এসেছে জীবনে; কিন্তু কখনো ভেঙ্গে পড়েনি, কারো কাছে মাথা নত করেনি, সামান্যতম অবজ্ঞা বা অপমানের তীব্র প্রতিবাদ করেছে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর দুরারোগ্য ব্যাধি তাকে হারিয়ে দিল। কুষ্ঠ হয়েছিল তার। কয়েক বছর আগে কলকাতায় হিমাংশুর মৃত্যু হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি যখন কলকাতায় যাই তখন ওর ওখানে গিয়েছিলাম। ও তখন শয্যাশায়ী, মৃত্যুপথযাত্রী। আমার স্ত্রীও ছিলেন আমার সঙ্গে।

হিমাংশুর সঙ্গে আমার স্কুলজীবনের বন্ধুত্ব কলেজ জীবন পেরিয়ে আমার কর্মজীবন ও সংসারজীবনকেও আলিঙ্গন করে। যতদিন ও বেঁচেছিল ততদিন পর্যন্ত সে বন্ধুত্ব অম্লান ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমাংশু চমৎকার ছবি তুলতে পারত। সুযোগ-সুবিধা থাকলে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে, সামান্য পৃষ্ঠপোষকতা যদি সে লাভ করত, তাহলে সে যে এই উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পী হতে পারত সে সম্পর্কে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। ওদের বাড়ির কাছেই ছিল সে সময়কার একটা নামকরা ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফির বিভিন্ন সরঞ্জামের দোকান। ফটো তোলাও হতো সেখানে। নাম ছিল, খুব সম্ভব, ইংরেজিতে Dass অথবা Doss স্টুডিও। প্রথমদিকে এই স্টুডিওর কিছু সহযোগিতা পেয়েছিল হিমাংশু। তাও ছিল অনুদার এবং স্বল্প সময়ের জন্য। কিন্তু ওইটুকুই হিমাংশু তার নিষ্ঠা ও প্রতিভা দিয়ে কাজে লাগিয়েছিল। ওর ঝোঁক ছিল নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে। আজ এসব কাজ খুব সাধারণ মনে হয়, নিত্য দেখি, কিন্তু চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে তাকায় তা অভিনব ছিল। নানারকম আলোছায়ার খেলা, সিলুয়েট, ফুলের মধ্যে মানুষের মুখ, সুপার ইম্পোজ করা মস্তাজ ধরনের ছবি, সাবজেক্টের অসতর্ক মুহূর্তের ঘরোয়া ছবির পাশাপাশি যত্ন সহকারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী মহড়া দিয়ে কম্পোজ করা আনুষ্ঠানিক ছবি প্রভৃতি সব ধরনের কাজে হিমাংশুর ছিল যেমন উৎসাহ তেমনি দক্ষতা। জীবিকা অর্জনের তাগিদে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে সে ছবি তোলাকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। পুরানা পল্টনে একটা রাস্তার মোড়ে এক ভদ্রলোকের অব্যবহৃত মোটর গ্যারেজকে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে হিমাংশু সেখানে দোকান খুলেছিল। নাম দিয়েছিল 'মাই স্টুডিও'। আমার বয়সী কারো কারো হয়তো আজও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাই স্টুডিওর কথা মনে আছে। ওই ছোট টিনের ঘরেই ছিল তার ডার্করুম, যাবতীয় আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম, নিজের তোলা চমৎকার কিছু ছবির ডিসপ্লে। কোনো পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল না সে। সাংবাদিক হিসেবে ছিল অজ্ঞাতপরিচয়। সম্পূর্ণত ফ্রিলান্সার। লোন উলফ। কিন্তু গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী, নিপুণ আলাপচারী হিমাংশু ছিল খুবই আত্মপ্রত্যয়ী। ওই অল্প বয়সে শুধু নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে সে সকল প্রোটোকল ভেঙ্গে কঠিন জায়গায় গিয়ে অনেক বিখ্যাত মানুষের ছবি তুলে আনতো। শুধু তাই নয়, তাদের সঙ্গে আলাপ করে অনেক সময় একটা ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতেও সক্ষম হতো। এইভাবে সে কী রকম করে হকির যাদুকর ধ্যান চাঁদ, আমাদের উপমহাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সরোজিনী নাইডু, শেরে বাংলা ফজলুল হক প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল, তাদের ছবি তুলেছিল, প্রদীপ্ত চোখে সে তার গল্প করেছে আমার কাছে। হিমাংশু আমাকে একদিন নিয়েও গিয়েছিল ধ্যান চাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়ার জন্য। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ধ্যান চাঁদ ছিলেন ঢাকাতে মোতায়েন ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন সাধারণ সদস্য। সেদিনের কুর্মিটোলায় সেনাবাহিনীর একটি খেলার মাঠের পাশে আমার দেখা হয়েছিল ধ্যান চাঁদের সঙ্গে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় হিসেবে তখন তাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। কিন্তু ধ্যান চাঁদকে দেখে বা তাঁর সঙ্গে কথা বলে সেটা বোঝার উপায় ছিল না। সরোজিনী নাইডুর সঙ্গেও কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তিনি কংগ্রেস আয়োজিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গণে স্বাধীনতা ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তরুণ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে একটি চমৎকার উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি। এসব প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। শেরে বাংলার ছবি তোলা প্রসঙ্গে হিমাংশু আমাকে একটি মজার কাহিনী শুনিয়েছিল। সে একদিন শেরে বাংলার বাসায় গিয়েছে। আগে থেকে দিনক্ষণ ঠিক করা ছিল। হিমাংশু বসবার ঘরে আসন গ্রহণ করে খবর পাঠাতেই ফজলুল হক এসে হাজির হলেন। দু'এক কথা বলার পর হিমাংশু তার ক্যামেরা ঠিক করে ছবি তুলতে উদ্যত হলো। তক্ষুনি শেরে বাংলা হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগে একটু সেন্ট মেখে আসি, কী বলো? বলেই সেই পুরোনো রসিকতাতে তাঁর বিখ্যাত ছাদ ফাটানো হাসি।

যে সময়ের কথা বলছি তখন আমরা থাকি মাহুতটুলির শরৎ চক্রবর্তী রোডে। তখন হিমাংশু প্রায় প্রতি বিকেলেই হেঁটে কিংবা সাইকেলে ওদের নবাবপুরের বাসা থেকে আমাদের বাসায় চলে আসত। ও না এলে আমি যেতাম। ছুটির দিনে ও চলে আসত। সকাল ন'টার মধ্যে। তারপর কত গল্প যে আমরা করতাম। কিসের গল্প তা আজ মনেও নেই। সম্ভবত স্কুলের গল্প, বন্ধু-বান্ধবদের কথা, নতুন পড়া বইয়ের আলোচনা, খেলার হারজিত ইত্যাদি। তবে সময় যে কিভাবে গড়িয়ে যেত দু'জনের কেউ-ই তা টের পেতাম না। শেষে যখন দুপুরের খাওয়ার সময় এগিয়ে আসত তখন হিমাংশু উঠে পড়ত, আমি তাকে এগিয়ে দেয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের বিশাল বটগাছটার কাছে গিয়ে থামতাম, তখন ও বলত, তুই এতটা পথ একা যাবি? চল, তোকে বাসায় পৌঁছে দিই। কতদিন এইভাবে যে আমরা আসা-যাওয়া করেছি তার ইয়ত্তা নেই। এখনো কি দুই কিশোরের মধ্যে এরকম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে? নিশ্চয়ই ওঠে, শুধু আমরা জানতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইকেলে পূর্ববঙ্গ সফরের পরিকল্পনা

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার পর আমি আর হিমাংশু ঠিক করেছিলাম যে আমরা দু'জন সাইকেলে পূর্ববঙ্গ সফরে বেরুবো। আমার বয়স তখন সবে পনেরো ছাড়িয়েছে। হিমাংশুর ষোলো। প্রথমে পরিকল্পনা করেছিলাম গোটা ভারত পরিক্রমার। পরে নিজেরাই নিজেদের বয়স, অভিজ্ঞতা, সামর্থ্য ইত্যাদির বিশদ বিবেচনার পর আদি পরিকল্পনা বাতিল করে দিই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পূর্ববঙ্গের সামান্য একটু অংশ ভ্রমণ করেই আমাদের অ্যাডভেঞ্চার পর্বের ইতি টানতে হয়। কিন্তু ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বার আগের ছোট একটা ইতিহাস আছে। তার কথা বলে নিই।

সাইকেলে করে আমরা দু'জন আনাড়ি কিশোর এইভাবে ঘুরতে বেরুব এটা আমাদের দুই পরিবারের বড়দের কারোরই ভালো লাগেনি। বিশেষ করে আমার পরিবারের। আমি ছিলাম বাড়ির প্রথম সন্তান, উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের আদরে লালিত কষ্ট সহ্য করার অভিজ্ঞতাহীন ছেলে। এইভাবে সাইকেলে ঘুরতে বেরুবার কথা শুনে আমার মায়ের চোখে তো পানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টলমল করতে থাকল। বাবা তখন চাকরিসূত্রে অন্যত্র থাকেন। আমাদের দেশ-ভ্রমণের পরিকল্পনার খবর পেয়ে একটা অসামান্য চিঠি লিখেছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত আমি চিঠিটা যত্ন করে তুলে রেখেছিলাম, এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না। কিশোরজীবনে অ্যাডভেঞ্চারের স্থান, আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন আর সাধ্য-সামর্থ্য, বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বয় বিধানের অত্যাবশ্যকতা, মা-বাবা কেন সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন হন এইসব কথা খুব সহজ ও সুন্দর করে লিখেছিলেন বাবা। শেষ পর্যন্ত তিনি ওই ভ্রমণের অনুমোদন দিয়েছিলেন, তবে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে মিথ্যা আত্মাভিমান অথবা জেদের বশে যেন কিছু না করি। অর্থাৎ সহজে যতদূর ঘুরতে পারি ততদূরই যেন যাই, তার বেশি নয়।

একদিন কাকডাকা ভোরে আমরা দুই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ঝোলার মধ্যে এক প্রস্থ করে শার্ট-প্যান্ট, গামছা-গেঞ্জি, টুথব্রাশ-টুথপেস্ট-চিরুনি, পানির ফ্লাস্ক, টর্চলাইট, ছোট একটা ছুরি, একট শিশিতে একটু আয়োডিন, একটা ছোট নোটবই ও পেনসিল, আরো দু'চারটে টুকিটাকি জিনিস। শেষ মুহূর্তে আমি, আগে পড়া হলেও, ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' বইটাও সঙ্গে নিয়ে নিলাম।

কত কাল আগের কথা। ১৯৩৮-এর একেবারে গোড়ার দিকের ঘটনা। সব আজ ভালো করে মনেও নেই। আমরা কিছু মাত্র স্ট্রেন না করে সহজভাবে সাইকেল চালিয়েছিলাম। দুপুরে একটা গঞ্জে থেমে সস্তা হোটেলে ডাল ভাত মাছ তরকারি খেয়ে নিয়ে তারপর আবার চলতে শুরু করি। সন্ধ্যার আগে হঠাৎ ঝড় উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি নামল। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। বাতাস ঠেলে সাইকেল চালানো কষ্টকর হয়ে উঠল। পরের জনপদ থেকে আমরা তখনো তিন-চার মাইল দূরে। ভিজে সপসপে হয়ে আমরা যখন সেখানে এসে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। সেটা ছিল ফরিদপুর শহরের কাছাকাছি একটা পুরোপুরি হিন্দুপ্রধান গ্রাম। গৃহস্থবাড়িতে শাঁখ বাজানো ও তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালানো হয়ে গেছে। গ্রামে ঢুকে একজন মাঝ বয়সী চাষীর কাছে খবর নিয়ে আমরা এক সমৃদ্ধ গোছের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলাম। বেশ সচ্ছল গৃহস্থ। হিন্দু। হিমাংশু আমাকে আগেই বলে দিয়েছিল যে এই রকম গ্রামাঞ্চলে দুটি অল্প বয়সের ছেলে, একজন হিন্দু ও আরেকজন মুসলমান, ওই রকম গোলমেলে পরিচয়ে আমাদের কোনো বাড়িতে আশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কাজেই আমি হয়ে গেলাম হিমাংশুর ছোট সুধাংশু। চেহারা, পোশাক-আশাক ও কথাবার্তায় কে কোনো ধর্মের তা বোঝার কোনো উপায় ছিল না। শুধু আমাকে সতর্ক থাকতে হবে যেন পানি বলে না ফেলি, হিমাংশুকে দাদা বলে সম্বোধন করি এবং এঁটো ডান হাতে কাঁসার গ্লাস তুলে নিয়ে পানি খাই। গৃহকর্তা সেই বাদলের রাতে আমাদের সমাদর করে আশ্রয় দিয়েছিলেন, শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন বাইরের ঘরে টিনের আটচালায়, খেতে দিয়েছিলেন চিড়া-মুড়ি-কলা ও দুধ।

আমরা পরদিন খুব ভোরে ওই গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তবে আমাদের কিশোর বয়সের সেই অ্যাডভেঞ্চার আর বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। শারীরিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লান্তি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার অত্যাচারে মধ্যাহ্নের দিকেই আবার আমরা ঘরের পথ ধরি। সব মিলিয়ে আমরা বোধহয় সোয়াশো মাইলের মতে ঘুরেছিলাম। যাই হোক, আজ কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গেলেও ওই সাইকেল ভ্রমণের স্মৃতি আমার মনে বহুদিন উজ্জ্বল হয়ে ছিল। হিমাংশু ও আমার বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে ওই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা একটা নতুন মাত্রিকতা যোগ করেছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌকা বাইচ ও জন্মাষ্টমীর উৎসব

স্কুলের ছাত্র হিসেবে সে আমলে গল্পের বই পড়া আর খেলাধুলার বাইরে অন্য কোনো বিনোদনের উপকরণ ছিল না বললেই চলে। খেলাধুলার মধ্যে আমার প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল ও হকি। স্কুলের মাঠের চাইতে আমি হকি বেশি খেলেছি ঢাকার নবাববাড়ি তথা আহসান মঞ্জিলের চৌহদ্দির মধ্যে প্রাসাদের সামনের ছোট মাঠটিতে। আমি আর আমার সমবয়সী দু'তিনজন ওখানে খেলতে যেতাম। নবাববাড়ির কয়েকটি ছেলে দুর্দান্ত খেলতো। তরুণ ও যুবক খেলোয়াড়দের মধ্যে ইউসুফ রেজার নাম আগেই বলেছি। অসম্ভব ক্ষিপ্রগতি। শর্ট কর্নার পেলে তার অব্যর্থ সুযোগ নিত।

নবাববাড়ির পেছনের দিকে নদীর ধার দিয়ে নির্মিত হয়েছিল সে যুগের জনপ্রিয় প্রভাতী ও বৈকালিন বেড়াবার জায়গা, বিখ্যাত বাকল্যান্ড বাঁধ। তখন ভিড় ছিল না, জলযানের মধ্যে দু'চারটে বজরা আর কিছু পানসি নৌকা বাঁধা থাকত এক অংশে। অন্য অংশে, বাদামতলী ঘাটের দিকে, কিছু পণ্যবাহী বড় বড় নৌকা এসে ভিড়ত। আমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনে বোঝাই করা আমের নৌকা। বাদামতলী ঘাটের লাগোয়া একটু পেছন দিকে ছিল আমপট্টি। গোটা অঞ্চলটায় আমের গন্ধ, খাবার পর পথের উপরেই ফেলে দেয়া আমের আঁটি ও খোসার স্তূপ, থিকথিকে কাদা, ব্যাপারিদের আনাগোনা, সব মিলে একটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু অন্যদিকে, অর্থাৎ নদীতীরে, বাকল্যান্ড বাঁধ ছিল খুবই রমণীয়, দূষণমুক্ত, চিত্ত প্রফুল্লকারী। আমরা ওখানে খুব বেশি বেড়াতে যেতাম না কিন্তু যখনই গিয়েছি খুব ভালো লেগেছে। প্রধানত সেটা ছিল প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের স্থান। তবে একটা সময়ে আমরা কিশোররাও সেখানে ভিড় জমাতাম। সেটা হলো নৌকা বাইচের সময়। খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমর্থকরা ঢোল-করতাল সহযোগে নিজ নিজ দলের দাঁড়ি-মাঝি মাল্লাদের অনুপ্রেরণা যোগাতেন। বার্ষিক নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা ছিল সত্যিই একটা জমজমাট ব্যাপার।

ওই সময়ে আরো দুটি উৎসবের কথা বেশ মনে আছে। প্রথমটি অবশ্য শোকের ব্যাপার কিন্তু কালের যাত্রার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে তা একটা উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। অন্তত অনেক মানুষের কাছে। যেমন ঘটেছে আজ আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারির ক্ষেত্রে। সেদিনের যে উৎসবের কথা বলতে যাচ্ছিলাম তা হলো মহররমের মিছিল। শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানরাই এতে অংশ নিত। মিছিল শুরু হতো হোসেনী দালান এলাকা থেকে। রূপালি কাজ করা নানা রকম ঝালর দেয়া জাফরি কাটা গম্বুজবিশিষ্ট, কতকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাজমহলের আকারের, তাজিয়া বানানো হতো। স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ দেহ পেশিবহুল তেজী একটা শাদা ঘোড়াকে দুলদুল সাজানো হতো। লাঠি আর সড়কি হাতে যোদ্ধার 'হায় হাসান, হায় হোসেন' বলে মাতম করতে করতে রাস্তা দিয়ে ছুটে যেতো। ঢাকায় এখনো মহররমের মিছিল হয়, কিন্তু সেই জৌলুস আর নেই। তার একটা কারণ হয়তো মুগ্ধ আর বিস্মিত হওয়ার সেই কৈশোরিক মনই আর এখন আমার মধ্যে নেই।

দ্বিতীয় যে উৎসবটি প্রতি বছর আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করত তা হলো জন্মাষ্টমীর মিছিল। এটা ছিল মহররমের মিছিলের চাইতেও জমকালো। অসম্ভব ভিড় হতো এই মিছিল দেখার জন্য। সবচাইতে বেশি নবাবপুর রাস্তার দু'পাশে। বাড়ির বারান্দায়, ছাদে, দোকানের সামনে, রাস্তার কিনারায় চার-পাঁচ সারি করে মানুষ তিন-চার ঘণ্টা ধরে ওই মিছিল দেখত। নানারকম বিচিত্র সাজ পরা পদাতিক দল থাকত। বিভিন্ন পেশার মানুষ নিজস্ব পেশার জিনিসপত্রের প্রদর্শনীর আয়োজন করত ... টায়ারের ওপর বসানো নানা আকারের গাড়ির ওপর নানা ভঙ্গিতে বসে দাঁড়িয়ে অংশগ্রহণকারীরা গান গাইতো, নাচত, পৌরাণিক চরিত্রে অভিনয় করত। সত্যিকার ফুল, কাগজের ফুল, আর অদ্ভুত সব মুখোশ ব্যবহৃত হতো ব্যাপক হারে। আমি একবার কয়েকজন সহপাঠীসহ আমাদের কলেজিয়েট স্কুলের কাছে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখেছিলাম। প্রচণ্ড ভিড়, রাস্তার সামনের দিকে প্রাপ্ত বয়স্করা দুর্ভেদ্য প্রাচীর বানিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা হাল ছেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিইনি। স্কুলের বারান্দা থেকে বেঞ্চি এনে চার বন্ধু তার ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। চমৎকার দেখতে পেয়েছিলাম সবকিছু। হঠাৎ লক্ষ করলাম আমাদের দলে একজন বয়স্ক মানুষ এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। অল্প জায়গার মধ্যে ভারসাম্য রাখার প্রয়াসে তিনি আমার বাম কাঁধ আঁকড়ে ধরেছেন তাঁর বাহু দিয়ে। মুখ ঘুরিয়ে দেখি পরিচিত ব্যক্তি। মিছিল দেখার জন্য কী প্রচণ্ড উৎসাহ তাঁর। ভদ্রলোক গ্রন্থাগারিক ও লেখক। নাম বললে অনেকেই চিনবেন। আবু যোহা নূর আহমদ। কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। আমি যখন সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে বাংলা একাডেমীর প্রধানরূপে কর্মরত তখন তিনি মাঝে-মাঝে আমার ওখানে আসতেন। নস্টালজিয়ার সঙ্গে তখন আমরা ত্রিশ বছর আগের আমাদের সেই এক বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখার গল্প করেছি একাধিক দিন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এন্ট্রান্স শেষে কলেজ

আমি ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দিই ১৯৩৮ সালে কলেজিয়েট স্কুল থেকে। আমাদের সময় ম্যাট্রিকই বলা হতো, তখন সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার নামটি চালু হয়নি। ম্যাট্রিক পাস করা ব্যক্তিকে বলা হতো ম্যাট্রিকুলেট, যেমন বি.এ. পাসকে বলা হতো গ্র্যাজুয়েট। আমাদেরও আগে, আমাদের বাবা-কাকা-জেঠাদের সময়, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাকে বলা হতো এন্ট্রান্স পরীক্ষা। এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা নামটা বেশ অর্থবহ ছিল। এই স্তর অতিক্রম করার পরই শিক্ষার্থী প্রবেশ করত আসল জায়গায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে। মান্নান সৈয়দ তার একাধিক গ্রন্থে, ভূমিকা বা উপক্রমণিকার জায়গায়, প্রবেশিকা লিখেছে। আমার কাছে ভালোই মনে হয়েছে। প্রবেশিকার পরে পাঠক পৌঁছবেন আসল জায়গায়।

ম্যাট্রিকুলেট গ্র্যাজুয়েট ইত্যাদি প্রসঙ্গে আরেকটি কথা মনে আসছে। আমি কাউকে কাউকে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কী এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে শুনেছি ম্যাট্রিক বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বি.এ. প্লাকড অর্থাৎ ফেল। এরকম উত্তর দেয়া যে নিজের জন্য অগৌরবের, তার চাইতে এটা বলাই যে শ্রেয় আমি ম্যাট্রিক বা বি.এ. পর্যন্ত পড়েছি, এ জ্ঞানটুকু কেন হয় না মানুষের?

যাই হোক, আমি ম্যাট্রিক পাস করি ঢাকা বোর্ডের অধীনে। তখন সমগ্র পূর্ববঙ্গের জন্য একটি বোর্ডই ছিল। ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী ও যশোর এই রকম চারটি বোর্ড ছিল না। আর ইন্টারমিডিয়েট স্তরও বোর্ডের অধীনে ছিল। তখন এই রকম চারটি বোর্ড ছিল না। আর ইন্টারমিডিয়েট স্তরও বোর্ডের অধীনে ছিল। তখন ওই নামই ছিল, হায়ার সেকেন্ডারি তথা উচ্চ মাধ্যমিক বা এইচএসসি নাম প্রবর্তিত হয়নি।

ম্যাট্রিকে আমি মোটামুটি ভালো ফল করি। অঙ্ক ও আরবিতে লেটার মার্কস পেয়েছিলাম। ইংরেজি ও ভূগোলেও তার কাছাকাছি। মেধা তালিকায় ছিল সপ্তম স্থান। ইংরেজিতে বরাবরই ভালো ছিলাম। এর পেছনে আমার বাবার অবদান ছিল খুব বেশি। তিনি গ্রামের স্কুলে পড়েছেন কিন্তু ভালো শিক্ষক পেয়েছিলেন। শব্দ সম্ভার ও ব্যাকরণের দিক দিয়ে ভিতটা পাকা হয়েছিল। তারপর ইন্টারমিডিয়েট ও বি.এ. পড়েন আলীগড়ে। সেখানে ইংরেজি ভাষী দক্ষ অধ্যাপকের কাছ থেকে যে সৃজনশীল তালিম পান তাই ইংরেজি ভাষার ওপর তার দখলকে উঁচু স্তরে নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে অবশ্য যুক্ত হয়েছিল নিজের ধীশক্তি ও অধ্যবসায়। আমাদের মধ্যে বাবা ওই সব গুণ সঞ্চারিত করতে আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। আমার মনে আছে আমাদের ছাত্রজীবনে বাবা যখন অন্যত্র থাকতেন তখন তাঁর কাছে ইংরেজিতে চিঠি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখতে হতো। তিনি আবার সেই সব চিঠিতে ভুল বা অপপ্রয়োগের জায়গাগুলো লাল পেনসিলে চিহ্নিত করে সংশোধনের পর আবার আমাদের ফেরত পাঠাতেন। আমাকে আর মুনীরকে। মুনীর সম্ভবত এই কারণেই বাবার কাছে খুব কম চিঠি লিখত।

স্কুলজীবনে টেস্ট পরীক্ষার পরে, আর ফাইনাল পরীক্ষার আগে, দু'মাস ছাড়া আর কখনো আমার কোনো গৃহশিক্ষক বা প্রাইভেট টিউটর ছিল না। ওই দু'মাসের জন্য বাবা দু'জন গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করে দেন। অঙ্ক আর ভূগোলের জন্য। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে ওই দুটি বিষয় আমি নিজে থেকে পড়তে চাই না। ওই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমার কেমন একটা ভীতি বা বীতরাগ আছে। তাই শিক্ষকের সামনে বসে দু'ঘণ্টা পড়ব, তাঁরা দেখে দেবেন, সাহায্য করবেন, পড়া ধরবেন, লেখার কাজ শুদ্ধ করে দেবেন, ব্যস। অঙ্কের শিক্ষক আসতেন সপ্তাহে চার দিন, ভূগোলের দু'দিন। কিছু দিনের মধ্যেই বিষয় দুটি সম্পর্কে আমার আগ্রহ অনেক বেড়ে গেল। ওই দু'মাসে কত যে অঙ্ক, বীজগণিত আর জ্যামিতির কাজ করেছি তার মনে হয় ইয়ত্তা নেই। অঙ্ক পড়াতেন সুদর্শন তরুণ এক এমএসসি'র ছাত্র। বাবার স্কুলজীবনের জনৈক মাস্টার মশাইয়ের আত্মীয়। চমৎকার বুঝিয়ে দিতে পারতেন, আমাকে কাজ দিয়ে নিজে অন্য বই পড়তেন, মাঝে মাঝে গুন গুন করে গান গাইতেন। একদিন শুনি সুর ভাঁজছেন ঢাকায় নতুন আসা ছায়াছবি নিউ থিয়েটার্স-এর *দিদির* গান—*স্বপন দেখি রাজার কুমার*। ছবিতে সায়গল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেয়েছিলেন। আমিও ফিল্মটা দেখে এসেছিলাম কয়েকদিন আগে। অঙ্ক কষা থামিয়ে মুখ তুলে স্যারের দিকে তাকাতেই তিনি সচেতন হয়ে গেলেন। তাঁর নাম আজ আর মনে নেই। পদবি ছিল খুব সম্ভব রায়। যেদিন তিনি পড়ানো শেষ করলেন বাবা একটা খামে একশো টাকা পুরে তাঁর হাতে দিলেন। সে সময় খুব একটা খারাপ সম্মানী ছিল না ওই অঙ্ক। কিন্তু তিনি কিছুতেই নিলেন না। বললেন, আমার বাবার মাস্টার মশায়ের সূত্র ধরে তিনি এই কাজটা করেছেন। তাছাড়া তিনি তো পেশাদার গৃহশিক্ষক নন, টিউশনি করেন না আর কোথাও, একটা প্রীতির সম্পর্কের জন্য আমাকেই পড়িয়েছেন শুধু। এরপর আর কথা চলে না। ওঁর কাছে আমার ওই দু'মাসের পড়া খুব কাজে এসেছিল।

ভূগোলের স্যারও খুব দক্ষ ছিলেন, তবে তিনি ছিলেন মাঝবয়সী, পেশাদার গৃহশিক্ষক, রাশভারি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার গুণে কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এবং কী ধরনের উত্তর লিখলে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে অতি উত্তম পরামর্শদাতা। তাঁর পড়াবার গুণেই আমি ম্যাট্রিকে ভূগোলে খুব উঁচু নম্বর পেয়েছিলাম।

ম্যাট্রিক পাস করার পর আই.এ. পড়বার জন্য ভর্তি হলাম ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। স্কুলজীবনে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের বিশাল সাদা স্তম্ভগুলো ও চওড়া কাঠের সিঁড়ি যেমন আমার মনে বিশেষ দাগ কেটেছিল, তেমনি এবার ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট কলেজের চওড়া গেট, বিশাল প্রাঙ্গণ, সাদা বিরাট দোতলা প্রাসাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো বাড়ি, লম্বা করিডোর আর স্বপ্নের আমেজমাখানো গম্বুজ আমাকে মুগ্ধ করল। দু'বছর পড়ি ওই কলেজে। ওই সুন্দর বাড়িটি তৈরি করা হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর, এই অঞ্চলের লাটভবনের জন্য। পরে যখন চালু হওয়ার আগেই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত রদ হয়ে যায় তখন ওই ভবনের বিকল্প ব্যবহারের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। আমাদের সৌভাগ্য যে এক সময় এটি শিক্ষাঙ্গনে রূপান্তরিত হয়।

স্কুলজীবনের মতো কলেজ জীবনেও পড়াশোনার পাশাপাশি খেলা, আবৃত্তি, বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে আমার প্রচুর উৎসাহ ছিল। পিংপং তথা টেবিল টেনিসে মশিহুর রহমানের কাছে হেরে যাই। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আজও মনে আছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~